...নের ভাষা হয়তো তেমন বুঝতে না পেরে একটা ভীত আর্ত্তনাদ তুলতে পারেন······

সুধীর কহিল—আর যে-ভাবের তরুণী তোমার স্মৃতিপথে জাগেন, সে তরুণীকে রবিবাবুর নৌকাডুবিতে, কি তাঁর লেখা কোনো ছোট গল্পে, কি কোনো কবিতার পংক্তিতে দেখেচি। অন্য লেখকের লেখায় এমনি তরুণী... সে ভাই দেখে খুব ভদ্র গোছের বলে মনে হয় না···

আমি কহিলাম,—ও-সব বাজে কথা ছেড়ে দাও হে। গিরিজার এই সূক্ষ্ম ব্যারামটুকু আমি বোধ হয় ধরতে পেরেচি। The eternal heroine! এ কথা খুব ঠিক। মানুষের মনে রোমান্সের একটা পিপাসা আছে। এ পিপাসার সৃষ্টি কি করে হলো, তা নিয়ে বহু তর্ক উঠতে পারে। উঠুক! তা নিয়ে আমাদের কারবার নয়! ওয়ার্ডসওয়ার্থের Reverie of Poor Susan পড়েচো তো...তাছাড়া রবিবাবুর কবিতাতেও বহু ইঙ্গিত? ধরো, আমি কলকাতায় মেশে থেকে কলেজে পড়ি। বিবাহ হয়েচে, দেশে তরুণী বধূ আছেন। প্রত্যহ তাঁকে প্রচণ্ড ...টর ভাজা খাওয়ার কবিতার paraphrase করে।

# নিশির ডাক

সহসা এক অপরাহ্নে পাশের বাড়ীর বারান্দায় লালপাড় একখানি শাড়ী শুকোতে দেখে বা পথে নূপুরের শিঞ্জন শুনে আমার সেই পল্লীবাসিনী তরুণী পত্নীর স্মৃতি মনকে নিমেষে আকুল করে তুললো—এমন তো হয়! আমি মেশের পাশের বাড়ীতে সেই শাড়ীর প্রান্ত দেখে পল্লীবাসিনী বধূর উদ্দেশে...

সুরেশ কহিল,— রুচি। এটা হলো artএর suggestiveness. কোনো নীরব রাতে বাঁশীর সুর কানে এসে লাগলে মন দুলে ওঠে···অনেক হারানো কথা বুকে উথলে মনকে মজিয়ে তোলে...ব্যস্, এই অবধি···thus far and no further. ঐ বাঁশী যে বাজাচ্ছে, তার পাশে গিয়ে যদি দাঁড়াতে চাও বন্ধু, তাহলেই mental shock আর crash...terrible রকমের!

সুধীর কহিল—ঐ শাড়ীর কথা! শাড়ী দেখে পল্লীবাসিনী পত্নীর দিকে ধাওয়া করা—অনায়াসে তা হতে পারে। কিন্তু যদি প্রতিবেশিনী শাড়ীর অধিকারিণীর জন্য ব্যাকুল হই, তা হলে তার ফল নানাদিক দিয়ে সাংঘাতিক হবে...গিরিজার মনের

যে, এই বর্ষায় বেরিয়ে পড়ি সেই কুঞ্জে···তরুণী যেখানে বিরহ-নিশি যাপন করচেন অশ্রু-সজল চোখে? কেমন, না···? এটুকু কাব্যে বেশ—বাস্তব লোকে নয়। তাছাড়া এ কল্পনার একটা বয়স আছে। হঠাৎ যদি দেখি, কাশীবাসী রিটায়ার্ড সব-জজ ত্রৈলোক্যচরণ চক্রবর্ত্তী মশায় দশাশ্বমেধ ঘাটে গাইতে বসেচেন, তুমি কাদের কুলের বৌ? তাহলে কুল-কামিনীদের ঐকান্তিক কামনার ফলে কুলপতির দল এসে তাঁর মাথায় লগুড়াঘাত করবে। Propriety বলে একটা জিনিষ আছে—মস্ত জিনিষ সেটা—তা কি কাব্যে, কি সংসারে!······

সুরেশ কহিল,—ঐ গিরিজা যা বলচে, বর্ষায় গোপন গহন থেকে কে যেন ডাকচে···ওটা ভারী খাঁটী কথা। সেকালে ঐটেকেই লোকে বলতো নিশির ডাক...এখন ওর নাম যৌবনের আহ্বান, অর্থাৎ call of youth.

আমি কহিলাম—ডাক চলুক, তাতে সাড়া দেওয়ায় অনর্থপাতের আশঙ্কা। তাছাড়া যে বয়সের যা! ছোলা-মটর ভাজা খাওয়ার সখ সদন্তের পক্ষে সহজ—অদন্তের

পক্ষে নয়! আমাদের ভাষাতেই কথা আছে না—শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে মেশা—বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ ...এমনি ধারা...? আমি দু-চারটে কাহিনী জানি। বলি। শুনলে বুঝবে, শুধু এই proprietyর অভাবে নিতান্ত নিরীহ প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ রোমান্সের সন্ধানে বেরিয়ে তার কি দাম দিয়েছিলেন! শুধু বিপন্ন হন্ নি—তাঁর সে বিপদের কথা শুনলে কারো বুকে সহানুভূতি জাগবে না, মুখে হাস্য উথলে উঠবে! এইটুকুই সব চেয়ে বড় ট্রাজেডি।

সকলে কহিল—বলো, বলো······

এমন সময় নীচেকার সিঁড়িতে দুপ্‌দাপ্‌ শব্দ···সঙ্গে সঙ্গে প্রেমাঙ্কুরের আবির্ভাব। সে কহিল—পাঁপর আর কাঁঠালবীচি ভাজা এনেচি—লুচি এবং ইলিশ মাছ আসচেন...অতএব······

আমি কহিলাম—যাত্রা স্থরু করে দেওয়া যাক······।

মণিলাল কহিল—খাওয়ার পর তোমার কাহিনী শুনতে চাই······

কহিলাম—বলবো। তেমন কাপুরুষ ভেবো না যে আহার সেরেই বিদায়ের পালা সারবো……

অচিরে চারু আসিল। বাহিরে ঝর-ঝর বরষা… ভিতরের উৎসব সুমধুর সরস হইয়া উঠিল…আধঘণ্টা যেন কল্পলোকে বাস! তারপর কাহিনী সুরু করিতে হইল।

---

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### রোগের বিষ

বিশ্বনাথ মস্ত কারবারী লোক। বয়স চল্লিশের কোটা পার হইয়া সবে এই একচল্লিশে পা দিয়াছে। বড়বাজারে তার লোহার মস্ত কারবার; শালকিয়াতে ফাউণ্ড্রী আছে। লোহা-লক্কড়ে চড়িয়া মা-লক্ষ্মী তার ঘরে আসিয়া নিজের আসনখানিতে বেশ কায়েমিভাবে বসিয়া দুই হাতে স্বর্ণবৃষ্টি করিতেছেন।

সেবার পাঁচ-সাত দিন ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগিয়া সারিয়া উঠিলে বিশ্বনাথকে ডাক্তার বাবু বলিলেন,—এক হপ্তা অন্ততঃ এখন দস্তুরমত বিশ্রাম চাই। কোনো কাজ-কর্ম্ম করা হবে না·····হার্টটা এখনও একটু দুর্ব্বল আছে। এ বয়সে শরীরকে মাঝে মাঝে বিশ্রাম দেওয়া চাই। তা [illegible] আপনার নেই···কেবল পয়সা-পয়সা!

# নিশির ডাক

ডাক্তার চলিয়া গেলে বিশ্বনাথের গৃহিণী শ্রীমতী কুঞ্জকামিনী বলিল,—শুন্‌লে তো ডাক্তারের কথা! তোমায় এখন কিছুদিন বাড়ী থেকে এক পা বেরুতে দিচ্ছি নে......তাতে তোমার কারবার থাক্ আর রসাতলেই যাক!

হাসিয়া বিশ্বনাথ কহিল—ছি ছি সাধ্বী সতী, কার-বারকে ঠেশ দিয়ে কোনো কথা কয়ো না, ওইটুকুর দৌলতেই যা কিছু......না যদি কোথাও বেরুই তো সময় কাটে কি করে?

কুঞ্জকামিনীর প্রাণের কোণে ছোট একটা নিশ্বাস জমিয়া উঠিল; প্রথম যৌবনের কথা মনে পড়িল! এই স্বামীরই তখন তার প্রতি কি অখণ্ড মনোযোগ ছিল! নিশ্বাস চাপিয়া সে কহিল,—তা বটে!......তা, লেখাপড়া করো না...এককালে তো সে সখও ছিল। কারবার করতে সেই প্রথম যখন ঢোকো, তখন তো ফিরে এসে এই লেখাপড়ারই চর্চ্চা করতে।

বিশ্বনাথ কহিল—তাই হোক্। খানকতক বইই দিয়ো...পড়া যাবে।

## নিশির ডাক

আহারাদির পর বিশ্বনাথ খাটে শুইয়া একখানা বাংলা বই পড়িতেছিল, পাশে একরাশ মাসিকপত্র। হালের যত বই ছাপিয়া বাহির হয়, তার সব কখানাই এ গৃহে দিব্য প্রবেশ-অধিকার পায়। খাটের উপর মেঝেয় মাদুরে বসিয়া কুঞ্জকামিনী একখানা কার্পেটের আসন বুনিতেছিল।

বইখানা খানিক পড়িয়া বিশ্বনাথ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চক্ষু মুদিল, তারপর আর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বইখানা রাখিয়া মাসিকের গোছা ধরিয়া টানিল; টানিয়া পাঁচ-সাতখানার পাতা উল্টাইয়া বইগুলা ছুড়িয়া দ্বারপ্রান্তে নিক্ষেপ করিল। কুঞ্জকামিনী চমকিয়া কার্পেট রাখিয়া স্বামীর পানে চাহিল, পরে উঠিয়া তার পাশে আসিয়া কহিল—হলো কি? এ্যা! বইগুলো ছুড়ে ফেল্‌লে যে!

বিশ্বনাথ কহিল—কি যে সব লেখে, বুঝি না। যেটা খুলি, ঐ এক কথা……

সকৌতুকে কুঞ্জকামিনী প্রশ্ন করিল,—কি কথা?

বিশ্বনাথ কহিল—রোমান্স! পথে-ঘাটে সর্ব্বত্র

রোমান্সের ছড়াছড়ি! রোমান্স এত শস্তা হয়ে উঠেচে, তা জানতুম না।

কথাটা না বুঝিয়া কুঞ্জকামিনী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিয়া রহিল।

বিশ্বনাথ হাতের কাছ হইতে আর একটা মাসিক-পত্র টানিয়া তার একখানা পাতা উল্টাইল; পরে পাতার উপর মিনিটখানেক চোখ বুলাইয়া কহিল—এই দ্যাখো! এতেও ঐ কথা......

কথাটা বলিয়া বিশ্বনাথ কাগজখানা কুঞ্জকামিনীর সামনে আগাইয়া দিল। কুঞ্জকামিনী পড়িল। একটি গল্প; গল্পের নাম, মরু-কটাক্ষ।

কুঞ্জকামিনী পড়িতে লাগিল,—

ঝাড়া এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেচে। পিচ-ঢালা পথ চকচক্ করছে, যেন এক প্রকাণ্ড কালো তিমির তেলা পিঠের মতো। মাঝে মাঝে দু'একখানা ট্যাক্সি ছুটে চলেছে—যেন রেড ইণ্ডিয়ানের তীর তিমির গা বিঁধতে এসে পিছলে গড়িয়ে সরে যাচ্ছে। আমি বেকার,—দুপুর বেলাটা চাকরির উমেদারিতে ঘুরে ঘুরে হায়রাণ, ভাবছি, এখন কি করি। মনের অবস্থা ঠিক যেন ধুনি-জ্বালা শীকার-প্রত্যাশী ছাইমাখা নাগার মতো!...

# নিশির ডাক

হঠাৎ ছড়ছড় শব্দে একখানা থার্ডক্লাশ গাড়ী আসছে, দেখলুম। গাড়ীখানা দেখবামাত্র আমার বুক ছাঁৎ করে উঠলো—নদীতে ঢিল ফেললে যেমন ছলাৎ করে জল ছিটিয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি। মনে হলো, যেন ঐ গাড়ীটা আমায় এ অকূলে কূলের সন্ধান বলে দেবে।... হলোও তাই।

গাড়ীটা আমার সামনে আসতে তার চাকাখানা ভেঙ্গে পড়লো—গরিবের টলটলে দেহখানার মতোই গাড়ীটা নড়বড় করছিলো...সঙ্গে সঙ্গে 'মাগো' বলে একটা আর্ত্ত রব ঠিকরে বেরুলো।

চোখ মেলে দেখি,—দুখানি হাত। তাজের শ্বেতপাথরের তৈরী দুখানি সরু থামের মতো। হাতে দুগাছি করে সোনার চুড়ি...যেন সাদা মেঘে বিজলীর রেখা। এগিয়ে গেলুম—তরুণী মূর্চ্ছিতা। তাকে বুকে তুলে পথে দাঁড়ালুম। পাশে একটা বাড়ীর রোয়াক—সেই রোয়াকের উপর মূর্চ্ছিতা তরুণীকে শোয়াবা মাত্র সে চোখ মেলে চাইলে, বললে—আর কত দূর ?

আমি বললুম—কোথায় যাবে তুমি ?

তরুণী মুচকে হেসে বললে—যাওয়ার শেষ হয়ে গেছে...দরদী তরুণ সঙ্গীর সন্ধানে বেরিয়েছিলুম—এমন বাদলায় ঘরে মন বসলো না, তাই...একটা থার্ড ক্লাশ গাড়ীকে সম্বল করেই নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি দিচ্ছিলুম।

আমি তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলুম। মনে হলো, আমি বেকার নই...কেরাণীগিরির উমেদার নই...আমি...আমি যেন ইরাণের বাদশা। মন বলে উঠলো—এই তো কামনার ধন। এর চেয়ে বড় কামনার বস্তু জগতে আর কি আছে রে তোর, বোকা!

বিশ্বনাথ বইখানা টানিয়া লইয়া বিরক্তি-ভরা স্বরে কহিল—কি এ পাগলামি বলো তো!—এই রকম লিখচে …আর কাগজে ছাপচেও!

কুঞ্জকামিনী কহিল—কেন?…কি হয়েচে?

বিশ্বনাথ কহিল—কেন, কি হয়েচে, বলচো।… প্রথমেই ছাখো, ঐ পথের উপমা……তিমির কালো তেলা পিঠের মত! তিমি-মাছ যেন নিত্য সকলে দেখচে, তাই তার উপমা চালিয়েছে!……পর-পর এমনি উপমার কেয়ারী বুনে গেছে, যার মানে হয় না! তার পর কল্পনা……ঐ বয়সের বাঙালী ঘরের মেয়ে থার্ডক্লাশ গাড়ীতে চেপে মনের মানুষ খুঁজতে বেরিয়েচে……আর ঐ সাদা মেঘে বিজলী-রেখা! এ জিনিষ চোখে দেখার সৌভাগ্য এই একচল্লিশ বছর বয়সেও হয়নি কখনো!

কুঞ্জকামিনী কহিল—গল্প গল্প, তার মধ্যে বুঝি আবার সত্যি কিছু থাকে!

বিশ্বনাথ কহিল—আর কিছু না থাক, তা বলে এমনি গাঁজার ধোঁয়া থাকবে!— বিশ্রী

ব্যাপার······আর এই সব লেখা পয়সা দিয়ে কিনচো তোমরা ?

কৃষ্ণকামিনী কহিল—জোড়া পোষ্টকার্ডে কি কাকুতি যে জানায়······কেনাবার জন্যে কি মাথা কুটে মরে,—আহা, বেচারারা ! কাজেই······

বিশ্বনাথ কহিল—না······এতে হতভাগা বেকুবদের বড্ড প্রশ্রয় দেওয়া হয়······যতগুলো বই খুললুম, ঐ এক কথা ! দেশের মেয়েদের এ হলো কি ? এ্যাঁ ! মান-ইজ্জৎ বিসর্জ্জন দিয়ে এমনি ছুটোছুটি করে সব ঘোরে কি বলে !······এ সব লেখা পড়ো না।

কৃষ্ণকামিনী কহিল—সময় কাটানো চাই তো ! তবে এ সব লেখার একটা গুণ আছে এই—দু ছত্তর পড়তে না পড়তে এমন ঘুম আসে যে, ও তিমিমাছ, থার্ডক্লাশ গাড়ী, ও-সব মনের কোণেও থিতুতে পায় না।

বিশ্বনাথ কহিল—না ! অনবরত এই সব পড়তে থাকলে মানুষ পাগল হয়ে যাবে...এই দ্যা[illegible] তো একটা নভেল ! নভেলের নাম—মনের দুণ। এমন

নামও কখনো শুনিনি! গল্প লিখচে,—এক বাড়ীর বৌ জানলার ধারে দাঁড়ায়, আর পাশের বাড়ীর এক ছোকরার সঙ্গে চোখে-চোখে দেখা হয়। একদিন বৌটা ছোকরাকে চিঠি লিখলে,—আমায় নিয়ে যাও। ছোকরা অমনি এক সন্ধ্যাবেলায় একখানা ট্যাক্সি নিয়ে হাজির। ······এ কি সব? মেয়েদের এমন অপমান করে এই সব অকালকুষ্মাণ্ডর দল বই লিখবে, আর মেয়েরাই পয়সা দিয়ে নিজেদের এই অপমানের কাহিনী কিনবে! এর জন্য রীতিমত শাসনের দরকার হয়েচে!

কুঞ্জকামিনী হাসিয়া কহিল—কে বা ঐ নিয়ে মাথা ঘামায়! লেখে ছাই-পাঁশ...সময় কাটাবার জন্যে পড়ি... পড়বার সময় আমরাই কি হাসি না, এ উদ্‌ভুট্টে পাগলামি দেখে?

বিশ্বনাথ কহিল—না, শুধু হাসি কি! এ সব বই পুড়িয়ে ফেলা উচিত। এ বই পড়ে সময় কাটানোর চেয়ে ধুলোয় পড়ে গড়াগড়ি খাওয়া ভালো—মদ খেয়ে মাতলামি করাও ঢের ইজ্জতের!

কুঞ্জকামিনী কহিল—বেশ তো বাবু......ও বই তোমায় পড়তে হবে না।

বিশ্বনাথ কহিল—তার চেয়ে সেই নার্শারির ক্যাটালগ্‌টা এনে দাও......বাঁধা কপির চাষের বৃত্তান্ত পড়ে আমি সময় কাটাই·····জরের পর অরুচির মুখে নানা তরকারীর নাম রুচবে ভালো!

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### বিষের ক্রিয়া

বাতাসের মুখে বট-অশথের ছোট বীজ যে কখন্ আসিয়া তিন-চারতলা বাড়ীর দেওয়ালের ফাটে গাড়িয়া বসে, তারপর ছোট চারা মাথা ঠেলিয়া ওঠে···কেমন করিয়া কি যে ঘটিয়া যায়, এ এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য!

বিশ্বনাথ একালের লেখায় বিরক্ত হইয়া মাসিক-পত্রের গোছা ফেলিয়া দিলেও সে লেখার কালির পোঁছ তার মনের কোণে লাগিয়া রহিল। কাজ-কর্ম্মের অন্তরালে সেই সব কালির পোঁছ কখনো হরফের মালা গাঁথিয়া, কখনো বা সেই সব মাসিক-গল্পের বিচিত্র নর-নারীর রূপ ধরিয়া তার চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে, বিশ্বনাথও তাদের দেখিয়া এক একবার

ভাবে, এই কঠিন বাস্তবের ফাঁকে একটু নয় উহাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করি! হানি কি! কাগজ ঠেলিয়া সেই সব নর-নারী যেন তাকে ডাকিয়া বলে, —বয়সগুলা ময়লা লোহা ঘাঁটিয়াই খোয়াইয়া বসিলে, বাপু! পয়সাই নয় করিয়াছ, সে পয়সায় দুনিয়ার কোন্ মণি-মুক্তাটাই বা হাতে পাইয়াছ!

ফলে দাঁড়াইল, বিশ্বনাথ ছুটীর দিনে ঐ সব মাসিক-পত্র খুলিয়া সে-গুলার পাতায় মনোযোগ অর্পণ করিয়া সময় কাটায়। কুঞ্জকামিনী আসিয়া হাসিয়া বলে—ও কি গো, হলো কি? ঐ সব ছাই-পাঁশ নিয়ে পড়ে আছো যে!

বিশ্বনাথ হাসিয়া জবাব দেয়,—হ্যাঁ। দেখচি, কি সব লিখচে।

কুঞ্জকামিনী বলে—তা বাবু, সময় কেটে যায় এক রকম করে—নয় কি?

বিশ্বনাথ কহিল—পড়ে এক একবার ভাবি, এ একঘেয়ে জীবনটা কেমন করে এমন হেসে খেলে কাটিয়ে এলুম! আমাদের বুকে কি দীর্ঘনিশ্বাসের

একটু ছিটে-ফোঁটাও ভগবান কখনো পুরে দেন নি? চাঁদ্‌নী রাতের বিহ্বলতা—এ জিনিষটা কি ছাই চোখেও কখনো দেখলুম না,—প্রাণেও কোনো দিন বুঝলুম না!

কুঞ্জকামিনী হাসিয়া কহিল—তামাসা রাখো। এ বয়সে আর তা বোঝবার চেষ্টা করো না—লোক হাসাবে।

বিশ্বনাথ কহিল,—আহা, তা নয় গো, শোনো, আমার তো এই বয়স হয়েচে। এ বয়সে অনেক দেশ ঘুরেচি—বৃষ্টি-বজ্রাঘাতের মধ্যে নির্জ্জন পথেও অনেক চলেছি, কিন্তু কখনো কোনো তরুণী বিপদে পড়ে আমার মুখের পানে চেয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে না একটু আশ্রয়ের ভিখারী হয়ে! আর এই গ্যাখো, এ বইখানাতে এই মাত্র পড়ছিলুম, এক নায়ক এগজামিনে ফেল করে বাড়ীতে তাড়া খেয়ে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে পথে এক মোটরের ধাক্কা খেয়ে হাসপাতালে মিষ্টার রায়ের তরুণী কন্যা পরাগিণীর প্রেমের স্পর্শে দিব্যি ভোল ফিরিয়ে ফেল্‌লে! মোটরে লোক চাপা পড়চে নিত্য, কিন্তু এই পরাগিণীর দর্শন বাস্তব

জীবনে কেউ পেয়েচে বলে শুনলুম না। ধাক্কা দিয়ে ফৌজদারী আদালতে আসামী হয়ে ড্রাইভাররা মোটা জরিমানা দিচ্ছে, নয় তো জেলে যাচ্ছে—এর চেয়ে বড় বেশী যাকে ভুগতে হচ্ছে, তাকে ড্যামেজ দিতে হচ্ছে! আইন-আদালতের এই সব মোটা কথা সব্য-সাচী লেখকের দল কি করে ভুলে যায় কুঞ্জ, তাই ভাবছিলুম...অথচ আইন-আদালতটা ভারী জীবন্ত, ভারী প্রত্যক্ষ সত্য।

কুঞ্জকামিনী হাসিয়া কহিল,—তোমার দেখচি ছোঁয়াচ লেগেচে! অত কথা কে-ই বা ভাবে, বলো? একদল লোক যা-খুশী লিখে যায়, আর একদল গো-গ্রাসে তাই পড়ে...দু'দলেরই সময় কেটে যাচ্ছে এক রকমে...

বিশ্বনাথ কহিল,—এক-একবার আমার কি মনে হয়, জানো...?

কুঞ্জকামিনী কহিল—কি ?

বিশ্বনাথ কহিল—একদিন এই সব গল্পের নায়কদের মত নিশীথের নিবিড় অন্ধকারে এই সহরের পথে

পথে উদাসীনের মত ঘুরবো…ঘুরে দেখবো, যথার্থই এই সহরের কোথাও কোনো রোমান্সের উপাদান ও-সময়ে মেলে কি না!

কুঞ্জকামিনী কহিল—দোহাই তোমার—এ বয়সে আর ও চেষ্টায় ঘুরো না...সর্দ্দি হবে, নয় তো পায়ের ব্যথায় এক মাস শয্যাগত থাকতে হবে।...তা ছাড়া দেখচো তো, ও-সব গল্পের নায়কদের বয়স বিশ-বাইশ বছরের মধ্যে, আর প্রায় সবগুলিই বেকার—বাড়ীতে হাঁড়ি চড়ে না, এমন অবস্থা...আমরা তো জানি, যে বেকার, সে পয়সা রোজগারেরই চেষ্টা করবে! ভগবান যদি কাকেও পয়সা থেকে বঞ্চিত রাখেন, তা হলে তার উচিত, সেই পয়সা রোজগারের চেষ্টা করা! তা না, এই সব বেয়াড়া সখ!

বিশ্বনাথ কহিল—আহা, এইখানেই তো মজা আরো বেশী! এই তো সব যত হাঘরে নায়ক...অথচ রাজকন্যা, সদাগর-কন্যারা তাদের ঘর-বাড়ী ছেড়ে এদেরই জন্য আকুল হয়ে পথে ছুটে আসে! সুপাত্রের

এমন, অভাব কখনো কোনো দেশে ঘটেচে? এ কথাও এই সব লেখকদের মাথায় আসে না?

কুঞ্জকামিনী কহিল—তোমার সঙ্গে আর বকতে পারি না বাপু, ও-গুলো রেখে একটু ঘুমোও দিকিনি! তবু একটু জিরেন পাবে।

কিন্তু জিরেন পাইবার উপায় না। এই সব লেখার আবহাওয়া ভূতের মত বিশ্বনাথকে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল। এগুলা পড়িয়া প্রথম বয়সের হারানো কত স্বপ্নই মনের আশেপাশে তারার মত ঝিকমিক করিয়া যে ফুটিয়া উঠিতেছিল! আলো-ছায়ার কত সে লুকোচুরি খেলা! আবার বয়সের মেঘ পরক্ষণেই সেগুলাকে ঢাকিয়া দিতেছিল! চল্লিশ বৎসর বয়সটার দুর্ব্বলতা এইখানে······

একবার যদি তার খেয়াল হয়, বিশ-ত্রিশের কোঠা পার হইয়া গিয়াছে, সামনে পঞ্চাশ তার জীর্ণ দ্বার খুলিয়া দাঁড়াইয়া...অমনি চঞ্চলতায় মন সারা হইয়া ওঠে! তাড়াতাড়ি ঐ বিশ-ত্রিশের গণ্ডীর দিকে হুঁশিয়ার দৃষ্টিতে তার সন্ধান চলিতে থাকে, কি ও-ধারে

ফেলিয়া আসিলাম, কোন্ হারানো স্মৃতি, কি ভোলা সুর, কিসের গন্ধ, কি ললিত স্পর্শ! ও-ধারে আজও কিসের উৎসব চলিয়াছে......হাসির বিদ্যুৎ আর অশ্রুর বাষ্পে কি মায়ালোকের ঐ অস্পষ্ট আভাষ জাগে! ভালো করিয়া সেগুলা দেখিয়াও আসিলাম না!—এমনি অস্থিরতার মুহূর্ত্ত বিরাম থাকে না!

বিশ্বনাথের মনে হইতেছিল,—দুনিয়াটা সত্যই শুধু লোহার থামের উপর খাড়া নাই···লোহার থামগুলার অন্তরালে বাগিচা আছে, সবুজ পাতার মাঝে মাঝে ফুলের বর্ণ-বৈচিত্র্য আছে, ফুলের পাপড়ির ধারে ধারে অলি-ভ্রমর গুঞ্জন-রব তুলিয়া ঘোরে, গাছের ডালে বসিয়া পাখীরা নানা সুরে গান গায়, বাগানের ধার দিয়া স্বচ্ছ নদীটিও লঘু ছন্দে তান তুলিয়া বহিয়া চলে······এ-গুলার কি কোনো অর্থ নাই,—না, এরা মানুষের মনের কোনো অভাব পূরণ করে না? তবে......?

কিন্তু হায়, এ-গুলার পানে না চাহিয়া শুধু এই লোহার থামগুলার পানেই নজর রাখিয়া সে এতখানি

# নিশির ডাক

পথ চলিয়া আসিয়াছে! আজ সে চলা-পথে ফিরিবারও উপায় নাই! পথের আশে-পাশে ঐ যে পাখীর গান, জলের তান, হাসির উচ্ছ্বাস, অশ্রুর আভাষ—এ-গুলার একটু পরশও সে লইতে পারে নাই! রুটিনে বাঁধা নেহাৎ একঘেয়ে জীবনটাকেই সে বহিয়া আসিয়াছে......শিব যেমন কোন্ অতীত যুগে সতীর প্রাণহীন শবদেহটাকে স্কন্ধে বহিয়া পাগলের মত চলিয়াছিলেন—এ'ও যেন ঠিক তেমনি! রূপ রস গন্ধ স্পর্শ......যা লইয়া এত লেখালেখি চলিয়াছে, তার কোনো পরিচয়ই সে কোনো দিন লইল না...এমন হতভাগ্য!

এমনি একটা চিন্তা বার বার তার মনে বিঁধিয়া তাকে কাতর পীড়িত করিয়া তুলিল।

---

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### তরুণী নায়িকা

রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। খিদিরপুরের ওদিকে নিমন্ত্রণ সারিয়া গৃহে ফিরিবার পথে বিশ্বনাথ গাড়ী হইতে মাঠের একধারে নামিয়া পড়িল। চাঁদের আলোয় চারিধার ঝলমল করিতেছে। ময়দানে লোক-চলাচল নাই। পথে গাড়ী রাখিয়া বিশ্বনাথ ময়দানের মধ্যে বহুদূর হাঁটিয়া আসিয়া একটা বেঞ্চে বসিল।

খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর তার মনে জাগিল—এই তো জ্যোৎস্না-রাত্রি, নির্জ্জন নিরালা মাঠ, সে-ও একা বসিয়া...গল্পের মত আবহাওয়া চারিধারে বেশ জমিয়া উঠিয়াছে! কিন্তু কৈ সে ত্রস্তচরণা নায়িকা...ঐ সব বইগুলার পাতায় পাতায় যার পায়ের ধ্বনি স্বপ্নসুন্দরীর নূপুর-গুঞ্জনের মত রণিয়া

রণিয়া বাজিয়া মনকে মাতাল মশগুল করিয়া তোলে ?

চিন্তার প্রাখর্য্যের অন্তরালে কৌতুকময়ী তন্দ্রার অদৃশ্য অলক্ষ্য গতি চিরপ্রসিদ্ধ। বিশ্বনাথের চিন্তার পিছনে তন্দ্রা আসিয়া তার চোখ চাপিয়া ধরিল... বড় মধুর আবেশ! সারাদিনের পরিশ্রম, তার পর নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে গুরুভোজনের পর তন্দ্রার এ স্পর্শে বিশ্বনাথ চেতনা হারাইল।

সহসা একেবারে পাশে স্খলিত কুণ্ঠিত স্বর—মশাই···

'মশাই' তখন তন্দ্রার স্পর্শে স্বপ্নলোকে কোন্ মণি-কোঠার দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন! তারপর প্রত্যক্ষ জীবন্ত স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে কাণের পাশে আবার সেই স্বর—মশায় শুনচেন···?

ধড়মড়িয়া জাগিয়া বিশ্বনাথ দেখে, সামনে দাঁড়াইয়া এক নারী···সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত...শুধু মুখখানির উপর কোনো আবরণ নাই! ঘুম-চোখে বিশ্বনাথ দেখিল, মুখখানি চমৎকার! মনে হইল, সেই গল্প[illegible]র মধ্য হইতে এই তরুণী আসিয়া শেষে এই ময়দানে দেখা

দিল !···চল্লিশ বৎসর বয়সের আবরণে চাপা-পড়া বিশ বৎসরের মন মাথা তুলিয়া আত্মগতভাবে বলিয়া উঠিল, এতদিন পরে মনে পড়লো, পাষাণী !

কিন্তু পাষাণী কথা কহিল। নারী বলিল,—বিপদে পড়েচি। বড্ড ভয় করচে···

দুই চোখ রগড়াইয়া মুছিয়া তন্দ্রার ঘোর কাটাইয়া বিশ্বনাথ চাহিয়া যা দেখিল, তাহাতে চমকিয়া উঠিল ! না, এ তো স্বপ্ন নয়···এ যে সত্যই নারী...শরীরিণী মূর্ত্তি··· এবং···এ যে তরুণী !...ভয় হইল। চিরদিনের সংস্কার-বশতঃ সে চারিধারে চাহিল, কোনো পুলিশ-পাহারওয়ালা সঙ্গে নাই তো ?—না...।

নারী কহিল—আমায় রক্ষা করুন...

এ যে সব মিলিয়া যাইতেছে। বাঃ! নির্জ্জন রাত্রি...আকাশে চাঁদ...একা সে...সামনে তরুণী... এবং তরুণী রক্ষা করিতে বলে! চকিতের জন্ম বিশ্বনাথের সংশয় জাগিল। সে বিশ্বনাথই তো? সেই ছেঁড়া মাসিকপত্রে ছাপা গল্পের বেকার নায়ক মমত্বনাথ নয়···? তন্দ্রার পূর্ব্বক্ষণে বিশ্বনাথ মুখে পাণ

চিবাইতেছিল—এই যে, সে পাণ এখনো মুখে আছে... তবে?

নারী কহিল—শুনতে পাচ্ছেন না, মশাই?

—এঁ্যা...বলিয়া বিশ্বনাথ তার পানে চাহিল।

নারী কহিল—আমি বিপদে পড়েচি।

বিপদ! বিশ্বনাথ চারিধারে চাহিল।—কি বিপদ? গোরায় তাড়া করে নাই তো?···জ্যোৎস্নার ফুটন্ত আলোর ধারায় চারিধারে যতদূর নজর চলে, বিশ্বনাথ চাহিয়া দেখে, ময়দানের কোথাও গোরার কোনো চিহ্নমাত্র নাই...তবে? ঐ ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গটা...ও-দুর্গও নিদ্রার নিবিড়তায় আচ্ছন্ন।···

দেখিয়া বিশ্বনাথের মনে আনন্দের সঞ্চার হইল। বিশ্বনাথ কহিল—কি বিপদ?

অশ্রু-জড়িত কণ্ঠে নারী কহিল—আমার স্বামী মাতাল, খিদিরপুরে থাকে—রোজ মারে, আজ মেরে তাড়িয়ে দেছে···আমি বাপের বাড়ী যাচ্ছিলুম...কিন্তু ভ[illegible] করচে···

বিশ্বনাথ তার আপাদমস্তক লক্ষ্য [illegible]রিল—নারী তরুণী বটে···মুখশ্রী মন্দ নয়। চোখের দৃষ্টিতে কাতরতা—

এমন কাতরতার পরিচয় সে সম্প্রতি গল্প-গুলার মধ্যেও পাইয়াছে প্রচুর !

বিশ্বনাথ তরুণীর মুখের পানে চাহিয়া ছিল—তরুণী তার পানে চাহিয়া···দু'জনে চোখোচোখি হইল ! ..তরুণীর চোখে অমনি একটা কটাক্ষ খেলিয়া গেল। যেন বিদ্যুতের একটি ঝিলিক ! অপ্রতিভভাবে বিশ্বনাথ চোখ নামাইল।

বিশ্বনাথ কহিল—আপনার বাপের বাড়ী কোথায় ?

নারী কহিল,—জানবাজারে... ।···তারপর মুখ নামাইয়া ধীরস্বরে কহিল,—আমায় 'আপনি' বল্‌বেন না, এ-দাসীর নাম মালতী।

দাসী ! বিশ্বনাথের বুকটা দুলিয়া উঠিল—মাথার মধ্যে রক্ত ছলাৎ করিয়া উঠিল। বিশ্বনাথ কহিল—বেশ, চলো,···আমার গাড়ী আছে···

মালতী একেবারে কৃতজ্ঞতায় গলিয়া গিয়া বিশ্বনাথের দুই পায়ে হাত রাখিয়া কহিল—আমায় কিনে রাখলেন আপনি...যদি কখনো সুদিন পাই...

বিশ্বনাথের ভারী লজ্জা হইল ! মালতীকে কথাটা

শেষ করিতে না দিয়া তাড়াতাড়ি সে বলিল—থাক্, থাক্,—তুমি এসো মালতী...

মালতীকে সঙ্গে লইয়া বিশ্বনাথ পথে আসিল। কোচম্যান-সহিস কি ভাবিবে? বাবু ময়দান হইতে সহসা এ কি রত্ন কুড়াইয়া আনিলেন!..যদি ভাবে, আগে হইতেই ষড় ছিল, তাই বাবু এত রাত্রে ময়দানে নামিয়াছিলেন?...বিশ্বনাথ মালতীর পানে চাহিল।

মালতীর মুখের আবরণ তখন আরো মুক্ত হইয়াছে... মুখের উপর গাছের ফাঁক দিয়া ঝরা জ্যোৎস্নার একটি রেখা পড়িয়াছে...অপরূপ! বিশ্বনাথ ভাবিল, তারা কিছু ভাবে যদি তো ভাবুক—তা বলিয়া এক বিপন্না তরুণীকে সে রক্ষা করিবে না? বিশেষ তরুণী যখন এমন অসহায়?

বিশ্বনাথ কহিল—জানবাজারে কোথায় যেতে হবে?

মালতী কহিল—হগ্ সাহেবের বাজারের পূব্ দিকে গলি—গলির নাম ইদু মিস্ত্রীর লেন।

বিশ্বনাথ কহিল—গাড়ীতে ওঠো...

মালতী গাড়ীতে উঠিয়া বসিল; বিশ্বন পরে উঠিল. উঠিয়া সহিসকে কহিল,—জানবাজার চলো।

বাতি জ্বালা হইল এবং গাড়ী চলিল।

গাড়ী চলিলে বিশ্বনাথ কহিল—তোমার মা-বাপকে কি বলবে...?

মালতী কহিল—তারা আমার স্বামীর কীর্ত্তির কথা জানে···বেশী কিছু বলতে হবে না।

পথের বাতির আলো চলন্ত গাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া মালতীকে ছুঁইয়া গেল। মালতীর চোখে তেমনি বিদ্যুৎ! বিশ্বনাথের মনে হইল, এ যেন কোন্ মায়ার রাজ্যে সে প্রবেশ করিয়াছে! বুকের মধ্যে সদ্য-পড়া গল্প-উপন্যাসের বড় বড় কথাগুলা এমন ভিড় করিয়া কলরব তুলিয়া দিল যে, তার মধ্য হইতে বাছিয়া কোন্ কথাটা প্রয়োগ করিবে, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া বিশ্বনাথ চুপ করিয়া রহিল। মালতীও চুপ। বিশ্বনাথ ভাবিল, মালতী কি ভাবিতেছে? বিশ্বনাথের কথাই?···মালতী যে বলিল—সে কেনা হইয়া রহিল! যদি সুদিন পায়...

কিসের সুদিন? যদি পায় তো কি—কি...?

হঠাৎ মালতী বলিল—এই যে, ডানদিকে ডানদিকে...

বিশ্বনাথ কহিল—ডাহিনা যাও।

একটা ট্যাক্সি হুশ করিয়া ...কের গলির মধ্যে ঢুকিয়া গেল। মালতী দেখি... তার সারা শরীর বহিয়া একটা পুলকের ঢেউ ছুটি... বিশ্বনাথ সেটুকু লক্ষ্য করিল না।

সে কহিল—ব্যাটা এমন করে ট্যাক্সি চালায়··· এখনি ধাক্কা দিয়েছিল আর কি!

বিশ্বনাথের গাড়ী ডানদি...র গলির মধ্যে ঢুকিল। খানিকটা যাইতেই মালতী কহিল—এবার থামাতে বলুন।

বিশ্বনাথ আদেশ দিল। গাড়ী থামিল। মালতী নামিল, বিশ্বনা...কে কহিল—তা হলে আসি! কিন্তু আপনি নামবেন না একবার? মার সঙ্গে···স্বরে কি মিনতি! বিশ্বনাথ গলিয়া গেল।

বিশ্বনাথও তাই ভাবিতেছিল, ইহার মধ্যে বিদায়! একবার বাড়ীটা দেখিয়া আসিবে না? সত্যই তো মালতীর মা-বাপ···একটা আত্মীয়তা···এই কৃতজ্ঞতার আবেগের এমন অবসর... ?

বিশ্বনাথ কহিল—চলো, তোমায় প... ছেড়ে দিয়েও যেতে পারি না তো!

একটা শাণ-বাঁধানো সরু গলি। মালতী সেই গলিতে ঢুকিল, ঢুকিয়া দ্রুত চলিল; বিশ্বনাথ তার পিছনে। দু'তিনটা মোড় বাঁকিয়া একটা ভাঙ্গা একতলা বাড়ী। মালতী গিয়া দ্বারে করাঘাত করিল। ভিতর হইতে লোক আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল—এক প্রৌঢ়া নারী। সে কহিল—কে? মালতী! তুই এত রাত্তিরে?

মালতী কহিল—আমায় তাড়িয়ে দেছে···এঁকে ধরে এলুম—ভাগ্যে এঁকে পেয়েছিলুম···

প্রৌঢ়া কহিল—এসো বাবা...একটু বসবে এসো।

বিশ্বনাথ একটু বিস্মিত হইল—এত বড় বিপদে দুটা কথায় সব বৃত্তান্ত সাফ হইয়া গেল! আশ্চর্য্য কি? মালতীই তো বলিয়াছিল, তার মা-বাপ স্বামীর কীর্ত্তির কথা জানে! এমনধারা প্রায়ই তার ঘটে!

বিশ্বনাথও বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। দূরে কোন্ বাড়ীর ঘড়িতে ঢং করিয়া একটা বাজিল।

---

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

### রোজা-সংবাদ

ঘরের মধ্যে তক্তাপোষে বিশ্বনাথ বসিয়া…মেঝেয় বসিয়া মালতী। ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে, মালতীর মা গিয়াছে পাণ সাজিয়া আনিতে। বুড়ী পাণ না খাওয়াইয়া এত বড় উপকারীকে কিছুতেই ছাড়িবে না।

বিশ্বনাথ ডাকিল—মালতী…

মালতী কহিল—আজ্ঞে…

বিশ্বনাথ কহিল,—তুমি যদি বলো, তা হলে তোমার স্বামীকে আমি শায়েস্তা করে দিতে পারি।

মালতী কহিল—থাক্…আমি আর সেখানে যাবো না।

বিশ্বনাথের বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। সে কহিল—সে কি হয়! হিঁদুর মেয়ে…স্বামী ছাড়া গ[illegible] নেই যে। তা ছাড়া তোমার এই বয়স…

আবেগের ভরে গলার কাছে আরো কথা ঠেলিয়া আসিয়াছিল। বিশেষ করিয়া, মালতীর ঐ রূপ! কিন্তু মালতী বাধা দিল। মালতী একেবারে বিশ্বনাথের দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া তার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া কহিল,—না. না,...তার চেয়ে এইখানে না খেয়ে শুকিয়ে মরবো···তাতেও আরাম!

বিশ্বনাথ আবেশে চক্ষু মুদিল—পায়ের উপর মালতীর মুখখানি···তা ছাড়া মালতী কি এ বলে···

সহসা মুগ্ধ মুদিত দুই চোখ খুলিয়া গেল ঝড়ের এক প্রচণ্ড রোলে! চোখ খুলিয়া বিশ্বনাথ চাহিয়া দেখে, সামনেই গুণ্ডার মত একটা লোক—হাতে তার মোটা লাঠি! লোকটা সগর্জ্জনে কহিল—বটে! এই জন্যে ছুটে আসা!······খাসা বন্ধু পেয়েচো! এ্যাঁ! আজ এই এক লাঠির ঘায়ে দু'জনেরই মাথা ফাটাবো।

রোমান্স, তরুণী...চকিতে কোথায় সব উবিয়া গেল! এ হুঙ্কারে মালতী সভয়ে সরিয়া ছিটকাইয়া পড়িল। লোকটা আগাইয়া আসিয়া কহিল—তুই কে রে ছুঁচো? পাঞ্জাবী জামা গায়ে নবাবী দেখাতে এসেচিস! আমার

ইস্তিরি···তার সঙ্গে তোর কিসের এত ভাব? পায়ে মাথা রেখে একেবারে মশ্‌গুল!···

বিশ্বনাথ তার আকৃতি আর ব্যবহার দেখিয়া ভয়ে এতটুকু হইয়া গিয়াছিল! বাপ রে, যেন শয়তানের মূর্তি! কিন্তু ইহার মধ্যেই এ খিদিরপুর হইতে আসিয়া এখানে উদয় হইল? আশ্চর্য্য! তবে কি সেই ট্যাক্সিটা? এইখানেই ট্যাক্সিটা আসিতেছিল বটে!····· তবু সে ব্যাপারটা বুঝাইবার চেষ্টা করিল।

লোকটা অতি বর্ব্বর। কোনো কথা কাণে তুলিতে চায় না! সে কহিল—যদি পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দি?

সর্ব্বনাশ! তাহা হইলে বেইজ্জতীর আর অন্ত থাকিবে না। কে তখন বিশ্বাস করিবে যে, কৃপাপরবশ হইয়া এক বিপন্ন নারীকে সে রক্ষা করিতে আসিয়াছিল মাত্র! খবরের কাগজে এই ব্যাপার কি কুৎসিত বীভৎস আকার ধরিয়া লোকের চোখের সামনে উদয় হইবে!······

বিশ্বনাথ কাঁদিয়া লোকটার পায়ে পড়িল, কহিল,—দোহাই বাপু, কোনো অসদভিপ্রায়ে আসিনি তুমি মালতীকেই জিজ্ঞাসা করো।

লোকটা হাসিয়া কহিল—মালতী তো তোমার দিকে হবেই চাঁদ! বলে, শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল!

বিশ্বনাথ কহিল—না, না—তা নয়···তুমি যা বলচো···

লোকটা মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইল, তারপর কহিল—এক কাজ করলে মানে-মানে ছেড়ে দেবো।

বিশ্বনাথ কাঁদ-কাঁদ স্বরে কহিল—কি কাজ, বলো?

লোকটা কহিল—দেড় হাজার টাকা যদি এখন দিতে পারো...

হতাশভাবে বিশ্বনাথ কহিল—কিন্তু অত টাকা তো আমার কাছে নেই।

লোকটা কহিল—তা হলে পুলিশের হাতে যাও।

বিশ্বনাথ কহিল—না বাবা, দোহাই তোমার......

লোকটা অটল। তার মুখে এক কথা—দেড়হাজার টাকা দিতে পারো তো খালাশ দি!

বিশ্বনাথ কহিল—কিন্তু অত টাকা চেক ভাঙ্গানো না হলে দেবার তো শক্তি নেই!

সে কহিল—বেশ, তবে চেক দাও দেড় হাজার টাকার।

বিশ্বনাথ কহিল—চেক-বই তো কাছে নেই। আমার সঙ্গে চলো।

লোকটা হাসিয়া কহিল—হ্যাঁ, কি কথাই বললে! আমি সঙ্গে যাই, তারপর ফাঁকি দাও……ফাঁকি কি? আমায় উল্টে পুলিশের হাতে দেবে তখন!

বিশ্বনাথ কহিল—তা হলে উপায়? বিশ্বনাথের চোখের সামনে এক অকূল সমুদ্র ফুঁশিয়া উঠিল!

লোকটা কহিল—চেক-বই আনাও। গাড়ী তো আছে। চিঠি লিখে দাও। আমার লোক ঐ গাড়ী করে গিয়ে চেক-বই আন্‌বে!—এই অবধি বলিয়া লোকটা হাসিল, হাসিয়া কহিল,—তবে চিঠি যা লিখবে, তা আমার কথামত।

দু'হাজার কি! বিশ হাজার টাকাও যদি এ চাহিয়া বসে, তাহা হইলে মুক্তির জন্য তা'ও বিশ্বনাথ দিতে রাজী আছে! মানে-মানে এখান হইতে বিদায় লইতে পারিলে তার যেন পুনর্জন্ম হয়! বিশ্বনাথ কহিল,—বেশ. কি লিখবো, বলো?

লোকটা ডাকিল—মালতী……

মালতী আসিয়া দাঁড়াইল। তার মুখে-চোখে ভয় বা কাতরতার চিহ্নমাত্র নাই! বিশ্বনাথ তাহা লক্ষ্য করিল। অথচ একটু আগেই...আশ্চর্য্য! ইহারি কথায়···সেও তবে ছল? ব্যাধের ফাঁদ?

লোকটা কহিল—কাগজ আর কালি-কলম নিয়ে আয় শীগ্‌গির······আজকের শীকার বহুৎ আচ্ছা হ্যায়!

মালতী তখান কাগজ, কালি, কলম লইয়া আসিল।

লোকটা কহিল—নাও, লেখো......চেক-বই পাঠাতে... কি কাজ করা হয়?

বিশ্বনাথ কহিল,—কারবার আছে।

লোকটা কহিল,—বটে, বটে, বেশ! তা হলে এই কথা লেখো—একটা জরুরি কন্‌ট্রাক্ট করার জন্য এখনি চেক-বই দরকার, না হলে সে কন্‌ট্রাক্ট হাত ফস্কে যাবে।······ তারপর আরো লেখো যে, কাজটা চুকিয়ে কাল বেলা একটা নাগাদ বাড়ী ফিরবো—ভাবনার কারণ নেই।

বিশ্বনাথ অবাক হইয়া লোকটার পানে চাহিল।

লোকটা কহিল—চেক সই করে আজ বাড়ী যাও, তারপর কাল ব্যাঙ্কে টাকা দিতে বারণ করে লিখে

পাঠাও—ব্যস……আমি ফাঁকিতে পড়ি? তা হবে না! আজ চেক দেবে, নিজের নামে Bearer-চেক—কাল সে চেক আমি ভাঙ্গিয়ে আনি, তারপর তুমি খালাশ পাবে……টাকা যদি ঠিক-ঠাক পাই, তা হলেই খালাশ.. না হলে থানা পুলিশ তো আর কাল পালাচ্ছে না……

কত বড় শয়তান! ওঃ, কি ফন্দীবাজ! বিশ্বনাথের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কিন্তু উপায় যখন নাই……

তখন লোকটার কথা মতই কাজ করিতে হইল।…… নিজের নামে দেড় হাজার টাকা Bearer-চেক লিখিয়া পিছনে endorse অবধি করিয়া দিতে হইল।

লোকটা চেক লইয়া হাসিয়া কহিল—এখন ঘুমোও নিশ্চিন্ত হয়ে……বলো তো, মালতী এসে নয় মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিক্! নরম হাত—কি বলো? এ্যা? হাঃ হাঃ হাঃ!

লোকটা অট্টহাস্য করিল। সে হাসি বাজের চেয়েও ভয়ঙ্কর!

বিশ্বনাথ কহিল—না থাক্, মাথায় যথেষ্ট হাত বুলিয়েচো…আর মালতীকে পাঠিয়ে কাজ নেই!

লোকটা কহিল—তোমার গাড়ী বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছি...ভাবনা নেই, কাল ট্যাক্সি ডেকে দেবো। আর একটা কথা...

বিশ্বনাথ তার পানে চাহিল। সে কহিল—একটু ছোট চিঠি চাই...এই বলে যে,—মালতী, তোমার সঙ্গে আর আমার কোন সম্পর্ক রইলো না...

বিশ্বনাথের গা ছমছম করিয়া উঠিল। এ শয়তানের আরো কি ফন্দী আছে! সে কাতরভাবে লোকটার পানে চাহিল।

লোকটা কহিল—মানে, এর পর বেরিয়ে গিয়ে যদি পুলিশে খবর দাও যে, দেড় হাজার টাকা চাপ দিয়ে আদায় করেছি......অবশ্য তাতে কিছুই এসে যাবে না! তবু......

বিশ্বনাথ কহিল—তেমন লোক আমি নই যে, এখান থেকে একবার বেরুতে পেলে আবার এ-ধারে পা দেবো!

লোকটা কহিল—ভালো, ভালো! তা হলে ঘুমোও। কাল সকালে চা পাবে, আর দুটী ভাত আর মাছের ঝোল···গরীবের খুদ কুঁড়ো...তা মালতী রাঁধে ভালো!...

বিশ্বনাথ কোনো কথা কহিল না। তার মনের মধ্যে যা হইতেছিল, তা অন্তর্যামী ভগবানই জানেন! এমন বিপদেও মানুষ পড়ে যে টুঁ শব্দটি মুখে বাহির করা যায় না!

বাড়ী ফিরিয়া ঘড়ির পানে চাহিয়া বিশ্বনাথ দেখে, বেলা আড়াইটা বাজে।

কুঞ্জকামিনী আসিয়া কহিল—হ্যাঁ গা, কি এমন কাজ যে, রাত্রে বাড়ী ফিরতে পারলে না! ভাবনায় মরি সারা রাত!

বিশ্বনাথ কাতর চোখে কুঞ্জকামিনীর পানে চাহিল,—অনিদ্রায় দুশ্চিন্তায় কুঞ্জকামিনীর চোখের কোলে কালি পড়িয়াছে!

বিশ্বনাথ বুকের কাছে টানিয়া তার বুকে মাথা রাখিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রচণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস বুক ভাঙ্গিয়া বাহির হইল।

কুঞ্জ কহিল—কি গা···অমন করচো কেন?

বিশ্বনাথ কহিল—মস্ত বড় কন্‌ট্রাক্ট, কুঞ্জ··· কথা পরে বলবো। আগে এক কাজ করো দিকিনি, ঐ যে ছাই-

পাশ গল্প আর উপন্যাস জড়ো করেচো ঘরে, সেগুলো এখুনি এনে নিজে তাতে খানিকটা কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন ধরাও—ধরাও আগুন···

কুঞ্জ কহিল—কি যে পাগলের মত বকো !

বিশ্বনাথ কহিল—পাগল নই, কুঞ্জ······এই ত্যাখো······ বলিয়া বিশ্বনাথ চেক-বইখানি খুলিয়া দেড় হাজার টাকার চেকের counterfoil দেখাইয়া কহিল—কি কন্‌ট্রাক্ট, দেখবে ? কিসের জন্য রাত্রে বাড়ী ফিরতে পারিনি···?

কুঞ্জ দেখিল, counterfoil-এ বড় বড় বাংলা হরফে লেখা আছে—রোমান্সের দাম।

সে স্বামীর পানে চাহিল।

বিশ্বনাথ কহিল—বিষ ধরেছিল, রোজার লাঠিতে নেমে গেছে···এখন এই অবধি—তারপর স্নান করে শুদ্ধ হয়ে সব কথা তোমায় বলবো—সব কথা—একটুও গোপন না রেখে···

কুঞ্জ অবাক্ হইয়া স্বামীর পানে চাহিয়া মুহূর্ত্ত দাঁড়াইল, তারপর তাড়াতাড়ি ডাকিল—ওরে ভিখ্‌না, বাবুর তেলের বাটী এই ঘরে দিয়ে যা।

# নিশির ডাক

গল্প শুনিয়া সুরেশ কহিল—এ হলো প্রৌঢ় বয়সে নিশির ডাক! তরুণ যৌবনে প্রিয়তমার পাশে বসে আছি, অথচ ঐ ডাক কোথা দিয়ে প্রাণে পৌঁছে বিস্তর মোহের সৃষ্টি করে—এমন একটি কাহিনী আমি জানি। তরুণ সে ডাকে ইঙ্গিতে সাড়া দেয়—বিশ্বনাথের মত দিক্‌বিদিকের জ্ঞান হারিয়ে মাঠে ছোটে না। তবু তার দুর্ব্বলতা কোন্‌খানে, সেটুকু ধরতে পারবে বেশ। অর্থাৎ এ ডাক অহরহ বাজচে...

মণিলাল কহিল—খুব ঠিক কথা! কালিদাসও বলে গেছেন—পশ্যানি রম্যান্...মনে পড়ে?

প্রেমাঙ্কুর কহিল—তোমার গল্প বলো...

সুরেশ তার গল্প সুরু করিল—

---

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

### নূতন ডাক্তার

ডাক্তার হইয়া নানা লোকের পরামর্শে বিমল আজ এ-ডিস্‌পেন্সারি কাল ও-ডিস্‌পেন্সারি ঘুরিয়া পূরা একটা বছর কাটাইয়া দিল, কিন্তু অর্থাগমের কোনো সুবিধাই কোনো দিক্‌ দিয়া ঘটিয়া উঠিল না। বিরক্ত হইয়া একটা চাকরির সন্ধানে মেডিকেল কলেজে ছুটাছুটি করিয়া যখন সে ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছে, তখন সহসা বন্ধু প্রমথ আসিয়া কহিল,—ওহে বিমল, আমি একটা ডিস্‌পেন্সারি খুলেচি বালিগঞ্জে।

বিমল প্রমথর মুখের পানে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিল।

প্রমথ কহিল,—তুমি ত এ-দিক্‌কার ডিস্‌পেন্সারিতে ঢের ঘুরলে, সুবিধা কিছু হলো না,—তা, বালিগঞ্জে আমার ডিসপেন্সারিতে দু'বেলা কিছুদিন বসে দ্যাখো না!

বিমল কহিল,—আমি ত ডিসপেন্সারির নেশা কাটিয়ে চাকরির পিছনে ঘুরচি।

প্রমথ কহিল,—মানে, বালিগঞ্জটা একবার দ্যাখো হে...ও-দিকে বিস্তর পয়সাওয়ালা লোকের বাস, ডাক্তার কম,—তা ছাড়া ইমপ্রুভমেণ্ট স্কীমের ফলে নতুন লোক্যালিটির সৃষ্টি হয়েচে—ও-দিকটায় আশা বিলক্ষণ। তা ছাড়া তুমি বাঙালী-পাড়াতেই এ্যাদ্দিন বসেচো। তার কুফল বিস্তর। অর্থাৎ—আমরা ভাই ফাঁকি দিয়ে যতখানি কাজ যার কাছ থেকে আদায় করতে পারি, উপায় দেখি। সব এই ফাঁকি মন্ত্রের উপাসক কি না, কাজেই বাঙালীপাড়ায় পয়সার দেখা পাওনি! তা ছাড়া ও-ধারে যত চেনা-শোনা লোক! তাঁদের এমন স্বভাব যে, পয়সা যতক্ষণ দিতে না হয়, ততক্ষণই আলাপ-কুটুম্বিতার দোহাই পেড়ে নতুন ডাক্তারের পিছনে ঘোরাফেরা করেন, পয়সা দেবার বেলায় অন্য ডাক্তারের দোরে ছোটেন...তারপর কোথাও যদি পয়সার জোগাড় হয়, এই ফাঁকিবাজরাই বেইমানী করে সে পথ বন্ধ করেন, বলেন, আরে ও নতুন ডাক্তার হয়েচে—জানে কি? পয়সাই যখন খরচ করচো,

ডাকো তখন নগেন চাটুয্যেকে নয়তো চারু বাঁড়ুয্যেকে। এই সব কারণেই ও-ধারে স্থবিধা করতে পারোনি...তা, বালিগঞ্জে একবার...

বিমল হাসিয়া কহিল,—বেশ, যাঁহা বাহান্ন, তাঁহা তিপ্পান্ন—এমনি তো বাজে ঘুরে মরচি, এ তবু বালিগঞ্জের হাওয়া খাওয়া যাবে।

প্রমথ কহিল,—তা হলে কাল থেকেই···কি বলো? শুভস্য শীঘ্রং...আমিও বিশেষ চেষ্টায় থাকবো।

বিমল কহিল—বহুৎ আচ্ছা।

নিমেষেই কথা পাকা হইয়া গেল। বিমল কহিল,—কাল সকাল থেকেই বসবো, তা হলে। ঠিকানা?

প্রমথ কহিল—৭ নম্বর পার্কার রোড। মানে, একদালিয়া রোডের গায়েই একেবারে, আর গড়িয়াহাট রোড থেকে পাঁচ মিনিটের পথ···ওখানটায় অনেক নতুন বাড়ী তৈরী হয়েচে···মস্ত কলোনি গড়ে উঠচে। আমার ডিসপেন্সারির নাম সবার্বন মেডিকেল হল। কালই সকালে আসচো তা হলে?

বিমল কহিল,—তুমিই তো বললে, শুভস্য শীঘ্রং।

চাকরির জন্য আর খোসামুদি করে ঘুরতেও পারচি না...simply abominable!

প্রমথ কহিল—বিজ্ঞাপনের ঘটা মোদ্দা একটু চাই... তা আমার ও আর্ট জানা আছে...আমি ও-দিকটা দেখবো...তুমি স্রেফ punctually হাজ্‌রে দিয়ে যেয়ো। ওষুধ বিক্রী হবে, তার কমিশন ভালো রকমই পাবে। আর ডিসপেন্সারিটি বেশ বড় এবং fit up করেচি একেবারে চমৎকার রকমে! দেখে খুশী হবে।

প্রমথ বিদায় লইল। বিমল ভাবিল, বালিগঞ্জটা এবার দেখা যাক। লাগে তুক, না লাগে তাক!

বিমলের বাপ অনেক পয়সা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁর ছিল কাঠের কারবার। তাঁর মৃত্যুর পর কাঠের কারবার বেচিয়া দিয়া বিমল বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে। ছোট পরিবার। বিধবা মা আর তরুণী পত্নী চারুপ্রতিভা—কাজেই ভাগ্য-পরীক্ষার জন্য দীর্ঘকাল পরখ করার অবসর এবং সুযোগও তার অপরিসীম।

---

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

## রূপসী পল্লীবাসিনী

প্রমথর কথামত পরদিন সকালে মোটরে করিয়া বালিগঞ্জের ৭ নম্বর পার্কার রোডে বিমল হাজিরা দিল। প্রমথ তখন লোক ডাকাইয়া নেম্-প্লেটের মুশাবিদা করিতেছিল। বিমলকে দেখিয়া প্রমথ কহিল—লিখে দিচ্ছি, specialist in diseases of the brain, female-diseases and in treatment of infants. এই অবধি বলিয়া সে থামিল, তারপর একটু হাসিয়া পরক্ষণে কহিল—বড় লোকের মাথার রোগটা প্রায়ই ধরে... আর বাড়ীর মেয়েছেলের নানান্ উপসর্গ আছে, অর্থাৎ এই দুটো লাইনে অনেক কথাই বলা হলো। নয় কি?

বিমল হাসিয়া কহিল—একেবারে একটা বড় হাসপাতালের সব কটা ডিপার্টমেণ্টই খুলে দিলে যে!

প্রমথ কহিল—ওহে এই advertisementই হলো এ-কালে লক্ষ্মীর বাহন! ও পুরোনো কদর্য্য প্যাঁচাটার পেন্‌সন হয়ে গেছে!

বিমল কহিল—বেশ, ও-ধারটায় আমার নজর দেবার প্রয়োজন নেই···আমার কাছে স্রেফ রোগী ধরে আনো।...

প্রমথ কহিল—উপস্থিত দু'জন হাজির রয়েচে। এক জন মিটার সাহেবের বাড়ীর দরোয়ান, আর একটি ফিশার সাহেবের মেমের আয়া।

বিমল কহিল—এদের নিয়েই গোড়াপত্তন?

প্রমথ কহিল—বড়লোকগুলো প্রথমটা নতুন ডাক্তারের হাতে নিজেদের সমর্পণ করতে একটু দ্বিধা বোধ করে··· প্রথমটা পরখ করে ঐ চাকর-দাসী দিয়ে...তা ভাই, ওরা advertising medium খুব ভালো। যদি দুটো মিষ্টি কথা কও, তা হলে ওরা গিয়ে বাড়ীতে মনিবের কাছে বলবে, ডাক্তারটি ভারী ভালো, বড় যত্ন নেন। আর, এই কথাগুলো কালে ফলপ্রদ হয়। আমার দু-তিনটে দৃষ্টান্ত জানা আছে। ঐ চোরবাগানের নগেন

বাবু...ছু-একটা বড় পরিবারে ঐ দাসী-চাকরদের চিকিৎসা থেকে স্থুরু করে ক্রমে তাঁদের বাড়ী একেবারে পূরা-দস্তুর কায়েমী হয়ে বসেচেন। তাঁর আসন এমন অটল যে, সেখানে কোনো বহিঃশত্রুর প্রবেশ একেবারে অসম্ভব! কথাটা বলিয়া প্রমথ আবার হাসিল।

বিমল কহিল—যাক, তোমার ডিপার্টমেণ্ট নিয়ে তুমি থাকো, আমি যাই, দরোয়ান-মহারাজ আর আয়া দেবীকে দেখে তাঁদের দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা করি গে...মিষ্টি কথা তো? তা এই সকালে প্রচুর সঞ্চিত আছে আমার প্রাণে! তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

প্রমথ কহিল,—ওষুধের দাম এদের বেলায় একটু কম করো, তবে রোগ তেমন না থাকলেও ওষুধ দিয়ো। ওতে রোগীর মন প্রসন্ন থাকে, আর দাওয়াইখানার প্রসন্নতা কাজেই অবশ্যম্ভাবী।

বিমল কহিল—সে শিক্ষা আমার হয়েচে হে...এক বছরে ওটা শিখেচি ভালো রকমই।

ছ'তিন মাসেই ফল পাওয়া গেল। বড় বাড়ীগুলার দাসী-চাকরকে অবলম্বন করিয়া ছেলেদের খোস-পাঁচড়া

ফোড়া প্রভৃতি দেখিবার অধিকার বিমলের মিলিতে লাগিল। তাহা হইতে বধূদের জ্বর, গৃহিণীর বাত, কর্ত্তার মাথা ঘোরা ও অগ্নিমান্দ্য। ঔষধগুলা ফলিয়া বালিগঞ্জ মহল্লায় বিমলের হাত-যশের একটা খ্যাতি রটনা করিল। ছ'মাস পরে সাবেক ফোর্ড-কার বেচিয়া নূতন মর্শ কিনিয়া বিমল বালিগঞ্জে আপনার পশার-প্রতিপত্তির পরিচয় দিতে কার্পণ্য করিল না; এবং আরও ছ'মাস পরে এমন হইল যে, বিমল ভাবিল, বিডন ষ্ট্রীট ছাড়িয়া এইধারেই কোথাও একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া আস্তানা পাতিবে কি না!

অভিপ্রায় শুনিয়া প্রমথ কহিল—না, না, রোগীর এত কাছাকাছি থাকা ঠিক নয়। বেশী সুলভ হওয়াটা ব্যবসার দিক থেকে ক্ষতিকর। মনে করলেই যে ডাক্তারকে হাতের নাগালে পাওয়া যায়, তার উপর রোগীর শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের দামও কমে…এ টেলিফোন করে ডাক্তারকে আনতে হবে—তাঁর জন্য এই যে প্রতীক্ষা করে থাকা, এতে ফীটা আদায় হয় [illegible]ট এবং সে ফীয়ের হার বর্দ্ধিত করাও সহজ হয়।

বিমল কহিল—বেশ, তা হলে এ-দিকে পরিবর্ত্তন অনাবশ্যক। তবে বাড়ী ফেরার সময়টা এমন অনির্দ্দিষ্ট হয়ে উঠেচে যে, গৃহিণীর মুখ অত্যন্ত রক্ত-রাঙা হয়ে ওঠে।

প্রমথ কহিল—হীরা-মুক্তার অলঙ্কারে ওই বাড়তি রাঙা রঙটুকু শুভ্রোজ্জ্বল করে দাও।

বিমল কহিল—ঠিক বলেচো!

আরো ছয় মাস কাটিয়া গেল। রোগীর সংখ্যার সঙ্গে ফীয়ের হার ক্রমে বাড়িয়া চলিল। এমন সময় এক ঘটনা ঘটিল...

বেলা বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। বিমল গৃহে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় বেয়ারা একখানা কার্ড লইয়া আসিয়া উপস্থিত। কার্ডখানা হাতে লইয়া বিমল পড়িয়া দেখে, কার্ডখানায় বিশেষত্ব আছে—বাঙলা হরফে নাম লেখা এবং নামটি এক বঙ্গ-মহিলার। কার্ডে লেখা আছে—শ্রীমতী বিদ্যুজ্জ্যোতি দেবী।

বিমল স্তম্ভিত! এই দিবা দ্বিপ্রহরে বিদ্যুজ্জ্যোতির আবির্ভাব! বালিগঞ্জে আসিয়া বড়-মানুষীর বহু মূর্ত্তির সঙ্গে তার পরিচয় হইয়াছে, কিন্তু আজ যে-বেশে...

"বেয়ারা কহিল,—ইনি দেখা করতে চান্ এখনই—জরুরী পরামর্শ আছে।

বিমল কহিল,—নিয়ে আয় এখানে।

বেয়ারা চলিয়া গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই ফিরিল, তার সঙ্গে নব্য-কেতায় শাড়ী-পরা এক তন্বঙ্গী মহিলা। পরিপাটী শ্রী, ফরসা রঙ, তার উপর পরণে চাঁপাফুল-রঙের ফুলদার গদ্দর শাড়ী, সেই কাপড়েরই ব্লাউজ, পায়ে নীল ভেলভেটের নাগরা জুতা। বিমল সসম্ভ্রমে সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাঁকে বসাইল।

শ্রীমতী বিদ্যুজ্জ্যোতি একটু চঞ্চল উদ্বিগ্ন স্বরে কহিলেন—একটু বিপন্ন হয়ে আপনার কাছে এসেচি...

বিমলের মনে হইল, বলে, বিপন্ন হইয়াই মানুষ তার কাছে আসে...নহিলে প্রয়োজনই বা কি এখানে আসিবার? কিন্তু সে কথা মুখে ফুটিল না।

শ্রীমতী বিদ্যুজ্জ্যোতি কহিলেন—অর্থাৎ আমার স্বামী। তিনি পল্লীগ্রামের এক জমিদার—ভারী জো[illegible]র মানুষ। তাঁর মাথার ব্যামো, ক'মাস দেশে [illegible]ৎসা হয়েছিল, তা কোন ফল হলো না। এখানে তাঁকে নিয়ে

এসেচি। আমরা আছি এখানে ভবানীপুরে ল্যান্সডাউন রোডে।

বিমল কহিল—আমায় যেতে হবে...?

বিদ্যুজ্জ্যোতি কহিলেন—তা হলে আর ভাবনা কি ছিল! তা হবার উপায় নেই...কথাটা বলিয়া তিনি নিরুপায় হতাশভাবে খোলা জানালার ফাঁক দিয়া বাহিরের পানে তাকাইয়া রহিলেন।

বিমল কহিল,—তা হলে...বলুন, কি করতে হবে?

বিদ্যুজ্জ্যোতি একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—একটু বুঝে...মানে, তা হলে আপনাকে সব কথা বলতে হয়...আপনার শোনবার সময় হবে?

বিমল কহিল—সময় আমার এই জন্যই তো...

বিদ্যুজ্জ্যোতি কহিলেন—ওঁর মাথার অসুখটা কি রকম, জানেন? সকলকে উনি সন্দেহের চক্ষে দেখেন... সকলে যেন ওঁর যথাসর্ব্বস্ব চুরি করে নিচ্ছে, ঠকিয়ে নিচ্ছে, এমনি! ডাক্তার দেখালে বলবেন, বিষ খাওয়াবে, বুঝি! ডাক্তারকে একেবারে মারতে উঠবেন! কাজেই আপনাকে নিয়ে যেতে পারচি না। এখানে তাঁকে

আনতে চাই...আপনি দেখে ব্যবস্থা করবেন। তাও তাঁকে জানতে দেওয়া হবে না যে, আপনি ওঁর চিকিৎসা করচেন! এমনি, বন্ধুভাবে। তারপর মাঝে মাঝে তিনি মানুষ চিনতে পারেন না—আমি কিছু খাবার তৈরী করে দিতে গেলে পিছিয়ে যান—বলেন, আপনি কে? অর্থাৎ সময়ে সময়ে আমাকেও চিনতে পারেন না—কি এ ট্রাজেডি বলুন তো?...আমি যেন জীবন্মৃত হয়ে আছি। আমার এক দণ্ড বাঁচবার সাধ নেই।—কথার শেষে বিদ্যুজ্জ্যোতির দুই চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল।

বিমল কহিল—বেশ, ও-বেলায় তাঁকে আনতে পারবেন?

বিদ্যুজ্জ্যোতি কহিলেন—কিন্তু ডিসপেন্সারি বলে বুঝতে পারলে যদি গোল করেন? আমি মহাবিপদে পড়েচি, ডক্টর ব্যানার্জী...

বিমল কহিল—তা এক কাজ করা যেতে পারে . আমার ডিসপেন্সারীর আর একটি দরজা আ ...ও দিকে...সেই দোর দিয়ে এনে আমার এই খাসকামরায়

তাঁকে বসালে তিনি চট করে বুঝতে পারবেন না, যে, এটা ডিসপেন্সারী...

বিদ্যুজ্জ্যোতি দেবী গলদশ্রুনেত্রে কহিলেন—ওঃ, তা যদি করেন ডক্টর ব্যানার্জী, তা হলে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। কি দুঃখে যে আমার দিন কাটচে···পয়সা-কড়ি, দাস-দাসী কিছু চাই নে আমি, আপনি দয়া করে আমার স্বামীকে ভালো করে দিন।

বিমল কহিল—বেশ, তাঁকে দেখি আগে···আপনি কেন ব্যস্ত হচ্ছেন আগে থেকেই? আজই বিকেলে তাঁকে নিয়ে আসুন।

বিদ্যুজ্জ্যোতি কহিলেন—আর একটু নিবেদন আছে...

বিমল কহিল—বলুন...

বিদ্যুজ্জ্যোতি কহিলেন—মানে, আপনি বিকেলে এখানে আসেন বেলা চারটেয়?

বিমল কহিল—হাঁ।

বিদ্যুজ্জ্যোতি কহিলেন—তখন অনেক রোগী থাকে। তা বেলা তিনটেয় যদি দয়া করে দেখবার ব্যবস্থা করেন...

বিমল কহিল—তা বেশ, তাই হবে। আমি বেলা আড়াইটেয় এখানে এসে অপেক্ষা করবো, আপনি তাঁকে তিনটের সময় নিয়ে আসবেন।

বিদ্যুজ্জ্যোতি কহিলেন—আঃ, আমায় কিনে রাখলেন, ডক্টর ব্যানার্জী···অশেষ ধন্যবাদ!···তা··· আপাততঃ···এইটুকু—বলিয়া বিদ্যুজ্জ্যোতি তাঁর হাতের ব্যাগ খুলিয়া তাহা হইতে টাকা লইয়া বিমলের সামনে টেবলের উপর রাখিলেন—চৌত্রিশ টাকা···টাকা রাখিয়া কহিলেন—এই ফীয়ে হবে?

বিমল কহিল—আমি এখানে ফী নিই না···

বিদ্যুজ্জ্যোতি কহিলেন—না, এটা দয়া করে নিতে হবে। না হলে বড় দুঃখিত হবো। আরও ষোল টাকা সে সময় দেবো...তারপর বরং চৌত্রিশ করেই নেবেন...পয়সা আছে আমার, কেন দেবো না?... আপনার ত এই ব্যবসা...

বিমলের সমস্ত শিরায় শিরায় রক্ত চন্‌মন্ করিয়া উঠিল। ডিস্‌পেন্সারীতে বসিয়া একটা খেয়ালী রোগী দেখিয়া নগদ চৌত্রিশ টাকা! সে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে

বিদ্যুজ্জ্যোতির পানে চাহিল, লক্ষ্মী, লক্ষ্মী, ইনি তো বিদ্যুজ্জ্যোতি নন, স্বয়ং বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মী আজ তার দাওয়াইখানায় আসিয়া ঝাঁপি খুলিয়া ধরিয়াছেন!...

বিদ্যুজ্জ্যোতি কহিলেন—তা হলে এখন উঠি··· অনেক বিরক্ত করলুম···মাপ করবেন।

বিমল কহিল—না, না, ও কি বল্‌চেন...আমার বহু ধন্যবাদ...

বিদ্যুজ্জ্যোতি অধরকোণে হাসির মৃদু বিদ্যুৎ ফুটাইয়া কহিলেন—তা হলে নমস্কার···

বিমল কহিল—নমস্কার, নমস্কার!

বিদ্যুজ্জ্যোতি উঠিলেন, বিমল তাঁর সঙ্গে আসিয়া তাঁকে গাড়ীতে তুলিয়া দিল। পথে একটা ট্যাক্সি অপেক্ষা করিতেছিল, বিদ্যুজ্জ্যোতি ট্যাক্সিতে চড়িয়া বিমলের পানে চাহিয়া হাত তুলিয়া ছোট একটু নমস্কার করিলেন, মুখে হাসির সেই মৃদু বিদ্যুৎ...বিমলও নমস্কার করিয়া হাসিয়া সে-হাসির জ্যোতির জবাব দিল। তারপর ট্যাক্সি চলিয়া

গেলে সে নিজের খাসকামরায় আসিয়া প্রবেশ করিল।

এত বড় জমীদার মক্কেল আসিয়াছে—পঞ্চাশ টাকা ফী! বেহারাকে কামরাটাকে দস্তুর-মত গুছাইয়া রাখিতে উপদেশ দিয়া বিমল গাড়ীতে গিয়া উঠিল। ঘড়িতে তখন একটা বাজিয়া দশ মিনিট।

---

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

### মোহ

তিনটা বাজিতে এখনো বারো মিনিট বাকী। বিমল খাস্‌কামরায় বসিয়া খবরের কাগজ নাড়া-চাড়া করিতেছে, আর প্রতিক্ষণে জানালা দিয়া পথের যে-অংশটুকু দেখা যায়, সেই দিকে অধীরভাবে লক্ষ্য করিতেছে। আসিবে তো?...কেন আসিবে না? নগদ চৌত্রিশ টাকা এমনি কিছু তাকে দান করিতে আসেন নাই! আরও ষোল টাকা!...ইহার পর হইতে চৌত্রিশ টাকা...কেন? না, ফী কমানো চলে না। ঐ পঞ্চাশই সে লইবে। রোগ সহজ নয়, তা ছাড়া এক ঘণ্টা আগে দেখিতে হইবে, এ সময়টুকুর দাম আছে তো! এ সময়টুকুর মধ্যে সে কত পঞ্চাশ টাকা হয়তো রোজগার করিত।

বিমল হাসিল, হায় রে, পয়সা মানুষকে কি দুর্ব্বার লোভাতুর করিয়া তোলে! ঐ বিদ্যুজ্জ্যোতি দেবী যদি একজন সামান্য লোক হইতেন? যদি এক পয়সাও না দিতেন? বেলা চারিটায় স্বামীকে লইয়া যদি আসিতেন......? তাহা হইলে বিমল একটি পয়সারও প্রত্যাশা না করিয়া তাঁকে দেখিত তো! আর ইনি বিশেষ ভদ্রতা দেখাইয়া এত টাকা দিয়া গেলেন, বিমলের লোভও অমনি এমন প্রচণ্ড বাড়িয়া উঠিয়াছে! এই জন্যই বলে, যার যত পয়সা, পয়সার তার তত বেশী লোভ!

সে আবার ঘড়ির দিকে তাকা[illegible] তিনটা বাজিতে পাঁচ মিনিট বাকী। তার উদ্বেগ [illegible]ল। খদ্দর-পরা বাঙালীর মেয়ে, তাও চিরকাল পল্লীগ্রামে থাকেন!—তাঁর এমন সাহেবী punctuality! [illegible] চালচলন ভারী স্বচ্ছন্দ রকমের,—কোথাও আড়ষ্ট[illegible] নাই। কি অবলীলাক্রমে এক অজানা ডা[illegible]রের কাছে আসিয়া স্বামীর রোগের কথা [illegible]নাইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া গেলেন! অনেক পুরুষ

মানুষও এমন পারে না। খাশা! উঠিয়া সে খড়খড়ির ধারে দাঁড়াইল……ঐ যে একটা ট্যাক্সি… ও-বেলার সেই ট্যাক্সিটাই না! সবুজ রং……সেই দাড়িওয়ালা শিখ ড্রাইভারটাই!……

ট্যাক্সি থামিলে বিদ্যুজ্জ্যোতি দেবী গাড়ী হইতে নামিলেন, গাড়ীতে আর একজন আরোহী ছিলেন,—পুরুষ, সাহেবী পোষাক-পরা। তাঁকে কি বলিয়া ত্রস্ত পদে আসিয়া বিদ্যুজ্জ্যোতি দেবী ডিস্‌পেন্সারীতে প্রবেশ করিলেন।

বিমল তাঁকে অভ্যর্থনা করিল। বিদ্যুজ্জ্যোতি দেবী একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন, কহিলেন,—ওঁকে এনেচি। কিন্তু খুব সাবধান! কোনো লোক পাঠিয়ে ওঁকে আনাবেন। আর আমার সামনে কোনো কথা নয়…তা হলে বিষম রাগে জ্বলে উঠবেন।

বিদ্যুজ্জ্যোতি দেবীর সর্ব্ব অঙ্গ কাঁপিতে-ছিল—একটা উত্তেজনা……বিপুল আবেগে কি চঞ্চলতা!

বিমল তাঁকে আশ্বস্ত করিয়া কহিল,—তাই হবে। আপনি উতলা হবেন না।

বিদ্যুজ্জ্যোতি কহিলেন—আপনার বাকি ষোল টাকা……। কিন্তু খুব হুঁশিয়ার—একেবারেই রোগের কথা পাড়বেন না, তা হলে কোন ফল হবে না। হয়তো—

বিমল কহিল,—আমার সব মনে আছে…বলিয়া সে পকেটে টাকা পুরিল। তারপর কহিল,—আপনি এই ঘরেই থাকবেন?

বিদ্যুজ্জ্যোতি কহিলেন—না, না, ওঁকে অন্য ঘরে দেখবেন!……এই অবধি বলিয়া তিনি চারিধারে চাহিয়া আবার কহিলেন,—তার চেয়ে আমিই অন্য ঘরে যাই……এই ঘরে ওঁকে দেখুন আপনি……

বিমল কহিল—বেশ, তা হলে আপনাকে অন্য ঘরে রেখে আসি, চলুন।

বিদ্যুজ্জ্যোতি দেবী উঠিলেন। বিমল তাঁকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া অন্য ঘরে বসাইল, তারপর কহিল—এটা আমার ড্রেশিং রুম। আপনি এখানে বসুন। আমি ওঁকে ডাকিয়ে আনাই………

বিদ্যুজ্জ্যোতি কহিলেন—এখনই...? আমার ভয় করচে...দু'পাঁচ মিনিট পরে আনবেন।

বিমল হাসিয়া কহিল—কোন ভয় নেই···আপনি এই বই বা কাগজ পড়ুন······

টেবলের উপর রাশীকৃত বই, খবরের কাগজ পড়িয়া ছিল। বিমল সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল; তার পর চলিয়া আসিল।······

সাহেবী পোষাক-পরা ভদ্রলোকটিকে আনিয়া খাস-কামরায় বসানো হইল এবং বিমল বিজ্ঞের ভঙ্গীতে তাঁর সঙ্গে দেশের অবস্থা, স্বরাজ্য দলের গতি, মিনিষ্ট্রীর শক্তি—এমনি নানা বিষয়ে আলোচনা সুরু করিয়া দিল। বহুক্ষণ এই সব আলোচনার পর বিমল কহিল—আপনার সঙ্গে লোকে ভারী চাতুরী সুরু করেচে, না? অনর্থক পয়সা-কড়ি ঠকিয়ে নেওয়া—চুরি······?

ভদ্রলোক কহিলেন—না। সে দিকে আমি খুব হুঁশিয়ার আছি। তবে ছোটখাট ব্যাপার...তা দু-একটা হয় বৈ কি মাঝে মাঝে।

বিমল কহিল—তা তো বটেই !...তা, এখানে কেমন দেখচেন সব ?

ভদ্রলোক বিস্ময়-পূর্ণ দৃষ্টিতে বিমলের পানে চাহিয়া রহিলেন।

বিমল কহিল,—আপনার ছেলেপিলে কটি ?

ভদ্রলোক কহিলেন—একটি ছেলে, দুটি মেয়ে…

বিমল কহিল—তারা এখানেই আছে ?

ভদ্রলোক কহিলেন—না: এখানে আমি থাকি একা, ঐ ক্যালকাটা বোর্ডিংয়ে...একখানি কামরা নিয়ে। তারা দেশে থাকে।

বিমল ভাবিল, এই যে, মাথার গোলমাল স্থরু হইয়াছে !…সে কহিল,—আপনার স্ত্রী শুধু আপনার সঙ্গে থাকেন ?

ভদ্রলোক,—না। তিনি সঙ্গে থাকবেন কি...

বিমল কহিল,—ভালো কথাই। তা, আপনি একবার এই কাগজটা পড়ুন তো…বলিয়া বিমল খবরের কাগজ-খানার একাংশ তাঁকে দেখাইল।

ভদ্রলোকের বিস্ময় সীমা ছাপাইয়া উঠিল। তিনি

বিমলের পানে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিলেন, তারপর খবরের কাগজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। একটা বাঙলা সাপ্তাহিক; সেটায় লেখা আছে—সেদিন গোয়ালন্দে একটা হাট পুড়িয়া গিয়াছে...লোক মারা যায় নাই, তবে পাট পুড়িয়াছে বিস্তর।

বেশ হইয়াছে! যেমন ধান ছাড়িয়া পাটের চাষ করা! ইহাকেই বলে, ভগবানের মার।

বিমল কহিল,—চেঁচিয়ে পড়ুন।

ভদ্রলোক কহিলেন—এ কি বলচেন আপনি!...আমি আর দেরী করতে পারবো না মশায়—দোকানে ঢের কাজ পড়ে আছে।

বিমল হাসিল, কহিল,—দোকান!...অর্থাৎ আপনার কি চিন্তা সর্ব্বক্ষণ, বলুন তো...

ভদ্রলোক কহিলেন,—আপনার কথা বুঝতে পারচি না,—এতক্ষণ তো নানা কথা কইলেন, এখন এ কি আবার পাট পোড়ার খবর পড়ালেন...মানে, আমরা ব্যবসাদার মানুষ, কাজ বুঝি...আমার পাওনাটা চুকিয়ে দিন, উঠে পড়ি...পাটের ভাগ্যে যা হয়, হোক্!

বিমল আবার হাসিল; হাসিয়া কহিল—পাওনা! কিসের পাওনা?

ভদ্রলোক আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন—আপনি কি বলচেন? আপনি তো ডক্টর ব্যানার্জী!

বিমল কহিল,—হাঁ।

ভদ্রলোক কহিলেন,—আপনার স্ত্রী এই মাত্র আমাদের ফার্ম্মে গিয়ে সেখান থেকে দুটো হীরের নেকলেশ, দুটো হীরের ব্রেশলেট, আর এক ছড়া মুক্তার কলার নিয়ে এসেচেন যে! আপনার পছন্দমত একটা নেকলেশ, একটা ব্রেশলেট, আর কলার ছড়া নেবেন এবং সেগুলোর দাম দেবেন বলে—এই বিল...ভদ্রলোক কথার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিল দেখাইলেন...

এ তো সত্যই বিল! ...চৈতন্যলাল শেঠ কোম্পানীর বিল! প্রায় দশ হাজার টাকার বিল!

একটা চিন্তা বিদ্যুতের মত বিমলের মনে ফুটিয়া উঠিল! সে বিলখানা লইয়া দেখিয়া কহিল,—আপনার নাম?

ভদ্রলোক কহিলেন,—আমার নাম চৈতন্যলাল শেঠ।

এত টাকার মাল লোকজনের সঙ্গে দিতে পারিনে বলে নিজেই এসেচি···

বিমল কহিল,—এখনই যে স্ত্রীলোকটি এলেন···?

চৈতন্য শেঠ কহিল,—আপনার স্ত্রী তো তিনি?

বিমল আকাশ হইতে পড়িল, কহিল,—আমার স্ত্রী?

চৈতন্য শেঠ কহিল,—আমাদের ওখানে আজ সকালে গেছলেন, তারপর আর একদিন গেছলেন,—মাল দেখে বললেন, আমার স্বামী ডাক্তার বিমল বানার্জ্জী, ৭ নম্বর পার্কার লেনে থাকেন, সেখানে যেতে হবে। মাল পছন্দ হলে সদ্য দাম চুকিয়ে দেবেন। তাঁর সময় কম, কাজেই আসা সম্ভব নয়······

চেয়ার ঠেলিয়া বিমল উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—বলেন কি, মশায়?

চৈতন্য শেঠ কহিল—এই তো বিল দেখলেন।

বিমল কহিল—আর আমায় এসে বলেচেন, তাঁর স্বামীর মাথার ব্যামো, দেখতে হবে, ব্যবস্থা করতে হবে... পঞ্চাশ টাকা ফী আগাম দেছেন...আমিও সেই বিশ্বাসে আপনার সঙ্গে আলাপ করচি।...এ তো আচ্ছা ফ্যাশাদ!

চৈতন্ত শেঠকে লইয়া বিমল সেই কামরায় চলিল—যেখানে বিদ্যুজ্জ্যোতি দেবীকে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বসাইয়া আসিয়াছিল...। সেখানে কেহ নাই...কামরা খালি। সেই সঙ্গে, সর্ব্বনাশ! বিমলের সোনার ঘড়ি-চেন টেবলের উপর ছিল, সেটাও অন্তর্হিত!

বিমল হাঁকিল,—বেয়ারা···

বেয়ারা আসিল। বিমল কহিল—সেই মা-জী... ?

বেয়ারা কহিল—ভক্তিবাবুর সঙ্গে কি কথা কইছিলেন···।

বিমল হাঁকিল—ভক্তি...

ভক্তি আসিল। ভক্তি কম্পাউণ্ডার। বিমল কহিল—সেই মহিলাটি?

ভক্তি কহিল—যিনি ট্যাক্সিতে এসেছিলেন... ?

—হাঁ, হাঁ,...

ভক্তি কহিল—তিনি বাইরে গেলেন, বললেন, আগেকার কি একটা প্রেসক্রপশন ভুলে বাড়ীতে ফেলে এসেচেন, সেটা নিয়ে এখনি আসবেন...

বিমল চেয়ারে বসিয়া পড়িল। কহিল,—আর তিনি এসেচেন!

চৈতন্য শেঠ কহিল—তা হলে ?

বিমল কহিল—আপনি ঠকের পাল্লায় পড়েচেন ! পুলিশ ডাকুন। ভক্তি, টেলিফোন করো—বালিগঞ্জ থানা...

চৈতন্য শেঠ বসিয়া পড়িল, কহিল—উপায় ?

বিমল কহিল—আমারও খুব লাভ ! আমায় পঞ্চাশ টাকা দেছে, কিন্তু আড়াইশো টাকার ঘড়ি আর তিনশো টাকার চেন নিয়ে গেছে...

পুলিশকে টেলিফোন করা হইল,—শীঘ্র আসুন, ভারী শক্ত কেশ্...

বিমল চৈতন্য শেঠকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। চৈতন্য শেঠ কহিল,—তাই তো মশায়, অমন সুন্দরী, অমন বেশ,...খদ্দর পরা ভদ্র চেহারা, মিষ্টি কথা···সন্দেহের কোনো কথাই মনে ওঠেনি...

বিমল কহিল,—আমারি কি হয়েছিল ! তবে এমন রোগী আজ পর্য্যন্ত দেখিনি। রোগী বা রোগ দেখার আগে হাতে ফীয়ের টাকা দেয়···তাও এত বেশী ফী নিজে থেকে...না চাইতে...

বালিগঞ্জ থানা হইতে ইন্‌স্‌পেক্টর ললিত বাবু

আসিলেন। সংবাদ শুনিয়া কহিলেন,—আরে মশায়, এমনি একটা কেশ দিন পনেরো আগে হয়ে গেছে। তুকারাম জহুরির ফার্ম্ম—তাদের ঠকিয়েচে এক ফ্রেঞ্চ ক্রপ শিঙ্কের শাড়ী-পরা বাঙালীর মেয়ে, জড়োয়া গহনা নিয়ে প্রায় বিশ হাজার টাকার। পুলিশ গেজেটে খপরটা বেরিয়েচে, দেখলুম। আচ্ছা, এঁর চেহারা কেমন, বলুন তো···?

বিমল আর চৈতন্য শেঠ দু'জনেই চেহারার বর্ণনা দিল,—দিয়া কহিল,—সুন্দরী! বেশ সুন্দরী! আর কি ভদ্র ছাপ্ চেহারায়! নাম বিদ্যুজ্জ্যোতি···তা বিদ্যুতের জ্যোতির মতই দেখতে।

ললিত বাবু হাসিলেন, হাসিয়া কহিলেন,—বিদ্যুতের জ্যোতি না হলে এমন electrify করতে পারে! তা, মোদ্দা, আমারো যতটা মনে পড়চে, এমনি চেহারা তারো বটে!...

চৈতন্য শেঠ কহিল,—উপায়?

ললিত বাবু কহিলেন—নিরুপায়। থানায় কেশ্ ডায়েরি করাবেন, চলুন...পুলিশ গেজেটে ছাপিয়ে দি···

যদি বরাতে থাকে, আসামী কোনো দিন গ্রেপ্তার হয়...

চৈতন্য শেঠ কহিল—না হলে···?

ললিত বাবু কহিলেন—ও গহনাগুলি বিদ্যুজ্জ্যোতিই ভোগ করবেন। কাগজে ছেপে দিন—যতদূর সাধ্য, দেখি।

চৈতন্য শেঠ কহিল—আমি পাঁচ হাজার টাকা রিওয়ার্ড দেবো, মশায়। বলেন কি, মেয়েমানুষের কাছে ঠকবো, পুরুষ-বাচ্ছা হয়ে... ?

ললিত বাবু হাসিয়া কহিলেন—সব বিষয়েই তো মেয়েমানুষের কাছে পুরুষ-বাচ্ছা ঠকে আসচে চিরকাল, মশায়। সুন্দরী তরুণী না হলে আপনিই কি অত বিশ্বাস করতেন আর কাকেও...না, ডাক্তার বাবুই অমন খাতির করে বসাতেন আর কাকেও···?

---

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## প্রস্তাবনা

কাহিনী শুনিয়া প্রেমাঙ্কুর কহিল,—এ তো গেল এক পক্ষের কথা। আর এক পক্ষের একটি কাহিনী আমি জানি। তা শুনলে বুঝবে, নিশির ডাকে নর-নারী উভয় পক্ষই বিচলিত হন।

গিরিজা কহিল—কিন্তু পুরুষের বেলায় মরীচিকা সার হয়! কারণ পুরুষের মধ্যে আকর্ষণী কম! রোমান্স বলতে যা বোঝায়, ক'জন পুরুষ সে রোমান্সের মর্য্যাদা জানে?

প্রেমাঙ্কুর কহিল—কিন্তু আমার এ কাহিনী শুনলে বুঝবে, নারীর পক্ষেও ব্যর্থতার নিশ্বাস ফেলার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। অতএব, বলি শোনো...

সোৎসাহে আমরা কহিলাম,—বলো...

কে অস্পষ্ট গুঞ্জন তুলিল—ইলিশ মৎস্যের কি হলো?

আমরা সমস্বরে কহিলাম—ভয় নাই ! যথাসময়ে তৈরী হয়েই তিনি আসবেন।

বাহিরে বৃষ্টি তখনো বেশ জোরে চলিয়াছে...

প্রেমাঙ্কুর কহিল,—অপর কাহিনীগুলির মর্ম্ম এবং তার সঙ্গে আমার কাহিনীর যোগসাধনের উদ্দেশ্য বজায় রাখতে হলে এ কাহিনীটির নাম-করণ অনায়াসে করা যেতে পারে—অতএব...

হাসিয়া আমরা কহিলাম—অতএব ?

প্রেমাঙ্কুর কহিল—হাঁ—অতএবই। শোনো...

---

# প্রথম পরিচ্ছেদ

## কর্ম্মযোগীর মর্ম্মরোগ

পাঁচ-সাত বৎসর নানা সভা করিয়া, বহু কাগজ-পত্র লিখিয়াও যখন দেশের চেতনাকে দেশের কর্ত্তব্যের দিকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিল না, তখন সহসা এক দিন অনিল বিবাহ করিয়া বসিল। বিবাহের মধ্যে একটু রোমান্স ছিল।

কাচাই-নদীর কূল ছাপিয়া ও-দিকটা বন্যায় ভাসিয়া গেলে রিলিফ-সমিতির কার্য্য-ভার বহিয়া অনিল গিয়াছিল নন্দীগ্রামে। সেখানে রিলিফের কাজে কলিকাতার নারী-সভা হইতে সুনন্দা দেবী ভলান্টিয়ার আসিয়াছিলে। সুনন্দা বি-এ ক্লাস অবধি পড়িয়া দেশের কাজে যোগ দিয়াছেন। রিলিফের কাজে আসিলেও তাঁর শান্ত নম্র

ব্যবহারে এমন একটী বৈশিষ্ট্য ছিল যে, শত মহিলার মধ্যেও সুনন্দার এ বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। তারপর সম্প্রতি দলের মধ্যে দু'চার রকম অশান্তি-উপদ্রবের সৃষ্টি হইলে অনিল ফশ্‌ করিয়া একদিন বলিয়া বসিল—আমি ব্রতভঙ্গ করে ফিরে চল্‌লুম।

দু-চার জন প্রশ্ন তুলিল,—কি করবে ফিরে গিয়ে?

অনিল কহিল,—গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালন করবো।

সকলে টিট্‌কারী দিল,—কাপুরুষ!

সুনন্দা দেবী আসিয়া নম্র বচনে কহিলেন—আপনি না কি চলে যাচ্ছেন?

অনিল কহিল,—হাঁ।

সুনন্দা দেবী নিমেষের জন্য চুপ করিয়া রহিলেন,—তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, তার পর মুখ তুলিয়া মৃদু হাস্যে কহিলেন,—কোথায় যাবেন?

অনিল কহিল,—আপাততঃ বাড়ীতে। বোধ হয় বাড়ীর সঙ্গে নতুন করে পরিচয় স্থাপন করতে হবে। মন টেঁকে, ভালো! না হলে বিপুল ধরণী-বক্ষে কোথাও উপনিবেশ স্থাপন করবো।

সুনন্দা দেবী আবার মুখ নত করিলেন। অতি-কষ্টে জবাবের সঙ্গে একটা উদ্যত নিশ্বাস রোধ করিলেন।

অনিল সুনন্দা দেবীর পানে চাহিল,—সূর্য্যাস্তের সোনালি আভা সুনন্দা দেবীর মুখে পড়ায় তাঁর চমৎকার শ্রী ফুটিয়াছিল!

অনিল কহিল,—আপনিও চলুন না। এখানে এত দিন তো দেখলেন!

সুনন্দা দেবী কহিলেন—আমার যাবার স্থান নেই তো কোথাও!

স্বর বড় করুণ; শুনিয়া অনিল সবিস্ময়ে কহিল—কেন?

সুনন্দা দেবী কহিলেন—মা-বাপকে ছেলেবেলায় হারিয়েছি। এক মামা আমায় পড়াতেন—বি-এ পড়ার সময় তিনিও মারা যান্। সে সময় এদিক থেকে ডাক এলো—আমিও ভবিষ্যতের কোন ঠিকানা না পেয়ে এধারে এসে পড়লুম।

অনিল কহিল—এসে এখানে ভবিষ্যতের কোন ঠিকানা পেলেন?

সুনন্দা দেবী ধীরে ধীরে অনিলের পানে চাহিলেন—

তাঁর চোখের পাতা কাঁপিতেছিল, মুখে লজ্জার রক্তিম আভা! অনিল দেখিল, ডাগর দুটী চোখ, কাজল-কালো তারা—আর সে চোখ বহিয়া রাজ্যের মিনতি যেন ঝরিয়া পড়িতেছে! সুনন্দা দেবীর মুখে কোন কথা ফুটিল না।

নন্দীগ্রামের তাঁবুর ধারে কবেকার সেই এক অপরাহ্ণ-বেলার কথা মনে পড়িল—সেই শান্ত শ্রী, বেদনা-ভরা সেই করুণ দৃষ্টি চোখের সাম্‌নে প্রথম যেদিন জাগিয়া ছিল! অনিল ভাবিয়াছিল, বোধ হয়, অনাথ গৃহহীনদের দুঃখে সমবেদনার ছায়া, তাই অমন করুণ! আজও ও দুই আঁখির দৃষ্টি হইতে সে করুণ ছবি মুছিয়া গেল না?—অতীত বেদনার সে স্মৃতি এত গাঢ়? এ করুণ দৃষ্টি-ভঙ্গীতে আজ অনিলের বুক দুলিয়া উঠিল। সে কহিল,—কিন্তু এখানে কি আপনি থাকতে পারবেন? এই দলে?

সুনন্দা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল,—না।

সুনন্দা দেবীর মনে পড়িল, এখানে সম্প্রতি ক'জন তরুণ তার প্রতি কি গভীর-রকম মনোযোগী হইয়া উঠিয়াছে! কোথাও বাহির হইবার সঙ্কল্প করিলে অমনি চারিদিক হইতে বিশ জন ছুটিয়া আসিয়া বলে—একলা

যাবেন না—সঙ্গে যাচ্ছি। তাকে একলা দেখিলে, অন্তরঙ্গতার জন্য কতখানি এরা লোলুপ হইয়া ওঠে! আর অনিল? তাকে দেখিলে চকিতে তারা সরিয়া যায়! তাই এই লোকটিকে দেখিয়া সুনন্দার ভয়াতুর মন এখানে থাকিবার সাহস পাইয়াছে—সে অমন কত বার!

অনিল কহিল,—তা হলে আপনিও চলুন আমার সঙ্গে। আমার কাজে সাহায্য করতেও পারেন, অবশ্য যদি আপনার আপত্তি না থাকে।

সুনন্দা দেবী আবার মুখ তুলিয়া চাহিলেন। অনিলের দুই চোখে হাসির দীপ্তি! তিনি কহিলেন,—কি সাহায্য? বলুন।

অনিল কহিল,—মানে, আমি বৈরাগ্য ত্যাগ কর্‌চি। গার্হস্থ্য আশ্রমে...

সুনন্দা দেবী কহিলেন—এত দিন আপনার স্ত্রীকে একলা দারুণ দুঃখে ফেলে রেখেছিলেন! তাঁর স্বর ম্লান।

অনিল হাসিল, হাসিয়া কহিল—রামচন্দ্র! স্ত্রী কোথায় পাবো? স্ত্রী থাকলে তাঁকে দুঃখ দেবো, এ ধারণা আমার সম্বন্ধে আপনার হয়?

অপ্রতিভ ভাবে সুনন্দা দেবী কহিলেন—না, না।

অনিল কহিল—ধারণা যদি না হয়, তবে এটুকুও বিশ্বাস করতে পার্‌বেন বোধ হয় যে স্ত্রীকে আমি কোন দিনই দুঃখ দেবো না।

এ কথার অর্থ? সুনন্দা দেবীর বুকের মধ্যে কিসের একটা তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল।

অনিল কহিল—যদি অনুমতি পাই, তা হলে নিবেদন...

সুনন্দা দেবীর বুক কাঁপিল।

অনিল কহিল—আপনার যদি আপত্তি না থাকে, মানে, আপনাকে পত্নীত্বে বরণ করবার সৌভাগ্য আমার...

পায়ের নীচে মাটীটা হঠাৎ বিষম বেগে দুলিয়া উঠিল। সুনন্দা দেবী টলিয়া পড়িয়া যাইতেছিলেন, অনিল তাঁর হাত ধরিয়া ফেলিল।

সুনন্দা দেবী লজ্জা-রক্তিম মুখে মৃদু স্বরে কহিলেন—ছাড়ুন। আমার মাথা কেমন ঘুরে গেছলো!

অনিল হাসিল, হাসিয়া কহিল—সেক্সপীয়র পড়েচেন?

ক্যালিদাসও পড়েছেন, নিশ্চয়? এক্ষেত্রে দু' জনের যা phycho-physiology, তা মেলে।

সুনন্দা দেবী প্রশ্ন-ভরা দৃষ্টিতে অনিলের পানে চাহিলেন।

অনিল কহিল—আপনাকে এখানে একা ফেলে গেলে আমার দুশ্চিন্তা কোন দিনই দূর হবে না। এবং আমার পক্ষে গার্হস্থ্য আশ্রমে সঙ্গিনী বধূ বলে নতুন কোনো অপরিচিতাকে এ-বয়সে গ্রহণ করাও কঠিন হবে। অতএব যদি আদেশ করেন···

সুনন্দা দেবী কোনো জবাব দিলেন না। ব্রতভঙ্গের কল্পনা কোনো দিন যদি তাঁর মনে জাগিত, তাহা হইলে এ লোকটিকে এখানে রাখিয়া যাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব মনে হইত! এই লোকটিই তাঁকে এ ব্রতে শক্তি জোগাইয়াছে। ইঁহাকে ছাড়িয়া এখানে থাকিয়া ব্রত পালন করাও চলিবে কি না, সন্দেহ! অতএব—

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### লেখিকা বান্ধবী

বিবাহ হইল ভবানীপুরের পৈতৃক বাড়ীতে। খবরের কাগজে এ বিবাহ লইয়া স্বপক্ষে ও বিপক্ষে উভয়বিধ আলোচনার ক্রটি ঘটিল না। তার ফলে বিবাহের পরই বর ও বধূ পক্ষের বহুবিধ বন্ধু ও বান্ধবী আসিয়া বর-বধূকে অভিনন্দন করিল।

অনিলের বন্ধু সতীনাথ কোথায় ছিল সুদূর গেঁয়োখালিতে। সেখানে ক'বৎসর ধরিয়া ধীবর সম্প্রদায়কে লইয়া স্কুল-পাঠশালা খুলিয়া তাদের বুদ্ধিবৃত্তি-বিকাশে সে পরম যত্ন লইতেছিল। যখন কলেজে পড়িত, তখন এক প্রোফেশরের সঙ্গে তার তর্ক মাত্রা ছাপাইয়া হাতা-হাতিতে পরিণত হয় এবং তারি ফলে 'রাষ্টিকেট' হইয়া সতীনাথ বিশ্ব-বিদ্যায় ইস্তফা দেয়। গেঁয়োখালিতে

পৈতৃক ভিটা ছিল; তার সংস্কার করিয়া সেইখানেই সে বসিয়া গিয়াছে। খবরের কাগজে হাঁকডাক জাহির করে নাই, নিঃশব্দে কাজে লাগিয়াছে।

বন্ধুকে দেখিয়া অনিল কহিল,—তুমি! আমি ভেবেছিলুম, দ্বীপান্তরে আছ, বুঝি! তা হঠাৎ মনে পড়লো যে!

সতীনাথ কহিল,—তুমি বিয়ে করচো, খবরের কাগজে দেখলুম। খপ্পর পড়ে প্রথমটা অবাক্ হয়ে গেছলুম! ভাবলুম, বাজে কথা! তার পর মন বেজায় চঞ্চল হয়ে উঠলো! ভাবলুন, দূর-ছাই, দেখেই আসি। তা love at first sight —না কি?

অনিল হাসিয়া কহিল—Love at last sight বরং। অর্থাৎ যা করছিলুম, ভালো লাগলো না। ভালো ঢের করা যায়—তবে গর্জ্জন যত হয়, বর্ষণ তার অনুরূপ নয়। ঘটা খুব। তবে দুঃখ এই যে ঘটার সিকিও ঘটনা ঘটে না। চলে এলুম তাই। আসবার সময় ইনি এমন করুণ চোখে চাইলেন—কাজেই...তা যাক্। আমার গৃহ-লক্ষ্মীর সঙ্গে আলাপ করো, খুশী হবে।

সতীনাথ কহিল,—বহুৎ আচ্ছা!

অনিল ডাকিল—সু—

সুনন্দা দেবী আসিলেন, আসিয়া কহিলেন—আমার এক বান্ধবী—

অনিল কহিল—এসেচেন? বেশ। ইনি হচ্ছেন আমার বন্ধু, সতীনাথ। আমরা আশৈশব এক সঙ্গে দুটীতে বেড়ে উঠছিলুম—কথা, কাজ, সব একসঙ্গে বরাবর। তার পর উনি গেলেন গেঁয়োখালিতে, আর আমি পূর্ব্ববঙ্গে।

সুনন্দা দেবী সতীনাথকে নমস্কার করিলেন, কহিলেন, —আমাদের ভুলে থাকবেন না।

সতীনাথ কহিল—নিজের চিন্তাও অনেক সময় ভুলেচি কিন্তু অনিলকে এক মুহূর্ত্ত ভুলি নি।

সুনন্দা দেবী কহিলেন—আমায় একটু ক্ষমা করবেন —আমার এক বান্ধবী—মিস্ নীতি সেন—মস্ত লেখিকা— নাম শুনেচেন, বোধ হয়! ডেকে আনি—আলাপ-পরিচয় হোক্!

মিস্ নীতি সেন আসিলেন। সুনন্দা দেবী পরিচয় করাইয়া দিলেন,—মিস্ নীতি সেন।

নীতি সেন কহিলেন—না, মিস্ নয়। শুধু নীতি। নীতি দেবীও চলতে পারে। মিস্ সেন বিলাতী—কাজেই আমার পছন্দ নয়।

সতীনাথ কহিল—আপনি লেখেন! নারী-জাগরণ সম্বন্ধে বুঝি?

সতীনাথের অপরাধ নাই। নীতি সেনের বেশ-ভূষা এমনি জাগরণেরই আভাস দিতেছিল!

বাধা দিয়া নীতি সেন কহিলেন—মাপ করবেন। প্রথমে ওই নিয়ে লেখা সুরু করি। কিন্তু কাকে জাগাবো? আমাদের দেশে নারী ক'জন আছে? আঙুলে গোণা যায়—বাকী সব কাঠের পুতুল! মন নেই, প্রাণ নেই,—নিজেদের সত্ত্বার কোনো পরিচয় জানে না, জানতে চায় না! তাদের জন্য খেটে মরা মিছে!

সতীনাথ অবাক্! অনিল স্তম্ভিত! নারী-বেশধারিণী এ যে সাক্ষাৎ অগ্নিশিখা! মিস্ মেয়োও বোধ হয় এমন চড়া স্বর তুলিতে পারে নাই!

সুনন্দা দেবী কহিলেন—এখন ইনি গল্প-উপন্যাসে হাত দিয়েছেন।

নীতি সেন কহিলেন—উদ্দেশ্য নিয়ে লিখচি। নারী আর পুরুষ দু-জনে যেমন দেখা হলো, অমনি প্রেমের সঞ্চার, তার পর হয় বিবাহ, নয় দীর্ঘনিশ্বাস—সে-সব পচা কাহিনী নয়। মনস্তত্ত্বের সুগভীর আলোচনা, গবেষণা—আপনারা নিশ্চয়ই বেনাভেন্ত, গকি, স্যুট হ্যামসন পড়েচেন?

সতীনাথ কহিল—পড়েচি। ইংরাজিতে যখন তর্জ্জমা মেলে, এবং ইংরাজী ভাষাও একটু-আধটু যখন জানি, তখন—

নীতি সেন কহিলেন—বেশ। তা হলে আমার উপন্যাসগুলো পড়বেন ছাপা হলে। বুঝতে পারবেন। অর্থাৎ আমি আপনাদের বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের মত ছেলে-ভুলোনো গল্প নিয়ে কারবার করতে চাই না। আমার এ উপন্যাসে যে-সব নর-নারীর কথা বলচি, তাদের হয়তো আজকের বাঙলা দেশে দেখতে পাবেন না! এরা অনাগত কালের জীব—পাঁচশো বছর পরে যারা এই বাঙলা দেশে জন্মাবে, তাদের মনস্তত্ত্বের পরিচয় পাবেন আমার বইয়ে।

অনিল ও সতীনাথ—দু'জনেরই চক্ষুস্থির! বহু দেশ, বহু আশ্রম ঘুরিয়া তারা বহু চরিত্র দেখিয়াছে—কিন্তু এমন—?

সুনন্দা দেবী কহিলেন—বিবাহ···ইনি বলেন, দুর্ব্বলের একটা বাজে ওজর! বিবাহের কোনো প্রয়োজন কারো থাকতে পারে না!

সতীনাথ কহিল—ঠিক! আমিও ঐজন্য বিবাহ করিনি। আর করবো বলে এখনো মনে হয় না!

নীতি সেন কহিলেন—That's right, নর-নারী এমন কোনো সূত্রে আবদ্ধ হতে পারে না, যার দরুণ তার নিজের ব্যক্তিত্ব কোথাও এতটুকু খর্ব্ব হবে! বিবাহ চিত্তে ক্ষুদ্রতা এনে দেয়। পরস্পরের মনে সামঞ্জস্য রাখতে হলে বহু কাটছাঁট করতে হয়। সমগ্র মনটি নিয়ে কেউ বাস করতে পারে না—তা কি স্বামী, কি স্ত্রী। তাতে মনের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়।

সতীনাথ কহিল—নিশ্চয়! স্বামী হয়তো বললেন—ওগো চলো আজ জু দেখতে। স্ত্রীর হয়তো তখন স[illegible] হয়েচে ইডন্ গার্ডেনে যেতে কিংবা ফুটবল ম্যাচ দেখতে।

দু'জনে দু'দিকে গেলে মান-অভিমান, রাগ-বিরাগ! এক জন যদি অপরের মতে সায় দিলেন, তা হলেই তো তাঁর ব্যক্তিত্ব সেখানে খর্ব্ব হলো!

নীতি সেন কহিলেন—আমারো ঐ মত। তা আমি তাই নন্দাকে বলছিলুম, মাস চারেক এখানে থাকবো। বিবাহিত জীবনটা কি—তার প্রতি নিমেষ আমি প্রত্যক্ষ করতে চাই। দেখবো, নারী আর পুরুষের মনে পলে পলে কি পরিবর্ত্তন আসে, কে কাকে উঁচিয়ে যায়! তার সুবিধা এখানে যেমন মিলবে, এমন আর কোথাও নয়। কারণ, নন্দাকে আমি দশ-বারো বছর ধরে জানি।

অনিল সতীনাথের পানে চাহিল, তার দৃষ্টির মধ্যে বহু প্রশ্ন জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠিল! সতীনাথ তা লক্ষ্য করিল এবং বুঝিল; বুঝিয়া সে চোখের দৃষ্টিতেই ভরসা দিল, মাথা খারাপ করো না, বন্ধু! নীতি সেন আবার কহিলেন—তা ছাড়া নন্দাকে পেয়েছি বহুকাল পরে। ওর এই অনভ্যস্ত প্রথম বিবাহিত জীবনে হয়তো নন্দা তার বান্ধবীকে পাশে চাইতে পারে—কাজেই, আমি স্থির করেছি, কিছুকাল এখানে থেকে যাবো!

অনিল কহিল—আপনার অনুগ্রহ! তবে আমার একটু নিবেদন আছে।

নীতি সেন কহিলেন—বলুন।

অনিল কহিল—আমরা দুজনে একযোগে স্থির করেচি যে দিন দশ-পনেরোর মধ্যেই আমরা পুরী যাবো। এই সহরের বদ্ধ বায়ুর চাপে আমাদের প্রথম জীবনের স্বপ্নগুলো পাছে দম্ বন্ধ হয়ে মরে ঝরে পড়ে, তাই—

নীতি সেন কহিলেন—চমৎকার! Just the idea! আমিও ঐ রকম একটা suggestion করবো, ভাবছিলুম! সে বেশ হবে। দশ-পনেরো দিন পরে তো—? এদিক্‌কার পাবলিশারের সঙ্গে আমারো ইতিমধ্যে কতকগুলো কথা শেষ করে ফেলা দরকার, সেগুলো তা হলে সেরে নি। তারপর এক সঙ্গেই পুরী যাবো। বাঃ, আপনাকে ধন্যবাদ, অনিলবাবু! আপনি আমার মনের কথা টেনে বলেচেন।

সুনন্দা লক্ষ্য করিলেন, এ ব্যাপারটা অনিলের খুব মনঃপূত হয় নাই। তিনি তো জানেন, অনিলের মাথায় কি-সব প্ল্যান আছে। তিনি কহিলেন,—

এসো নীতি, ছু-জনে একত্র হয়েচি, অনেক কথা জমে আছে। ওঁরাও ততক্ষণ গল্পস্বল্প করুন! তা হলে আমরা আসি সতীনাথ বাবু।

সতীনাথ কহিল—বেশ।

সুনন্দা ও নীতি চলিয়া গেলেন। সতীনাথ অনিলকে ঠেলা দিয়া কহিল—কি ভাবচো, বন্ধু?

অনিল একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—এ কি আপদ আবার!

হাসিয়া সতীনাথ কহিল—রবিবাবুর কবিতা মনে পড়চে,—ঐ আসে, ঐ অতি ভৈরব হরষে...

অনিল কহিল—তোমাকে ছাড়চি না তা হলে। অনাগত পাঁচশো বছরের এই মনস্তত্ত্ববিদের পাল্লায় পড়লে আমাদের সব সোনার স্বপ্ন টুটে যাবে! তুমি থেকে যাও, বন্ধু—বন্ধুর কর্ত্তব্য করো।

সতীনাথ কহিল—এখন কিছুকাল কিন্তু বন্ধুকে ভালো লাগবে না ভাই! বিবাহের প্রথম আঘাত এসে লাগে বন্ধুত্বের গায়। ছুটীতে এখন অখণ্ড মিলনে বিভোর থাকবে। তার মধ্যে বন্ধু এসে ডাকাডাকি করলে

মিলনের রাগিণী চূর্ণ হয়ে যাবে, মনে বিরোধ জাগবে। আগে এ জীবনের মাধুরী কিছু সঞ্চয় করো, তখন বন্ধুকে প্রয়োজন হবে, সে সব কাহিনী শোনাবার জন্য।

অনিল কহিল—কিন্তু ওই সেন—?

সতীনাথ কহিল—পুরী যাও। ইনি সঙ্গে যেতে চাইছেন,···মানা করো না। বান্ধবীর মনে আঘাত লাগবে। তার পর প্রয়োজন বোধ করো, চিঠি দিয়ো,—আমি যাবো।

অনিল কহিল—বেশ, এই কথাই রইলো তা হলে ?

সতীনাথ কহিল—রইলো।

---

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### কমলে কণ্টক

পাঁচ-ছ'মাস পরের কথা।

সকাল বেলা পুরীর সমুদ্রতীরে একা বসিয়া অনিল,—বোধ হয় সমুদ্রের ঢেউ গণিতেছিল!

সতীনাথ আসিয়া ডাকিল,—বন্ধু···

অনিল চমকিয়া চাহিয়া দেখে, বন্ধু সতীনাথ। সে কহিল,—এসেচো? তা কোথায় এসে উঠলে?

সতীনাথ কহিল,—কাল রাত্রে এসে ভিক্টোরিয়া বোর্ডিংয়ে উঠেচি।

অনিল কহিল,—কেন? এখানে আমার আস্তানা থাকতে...?

সতীনাথ কহিল—এখন তোমার জীবনে এক নূতন অঙ্ক সুরু হয়েচে, বলেচি না! এখন বাহিরের কোন

কলরব ঘরে এনো না। ছোটখাট মান-অভিমান, প্রণয়ের সহস্র লীলা—তৃতীয় ব্যক্তির সান্নিধ্য তার মধ্যে মস্ত বিরোধ জাগাবে।

অনিল কহিল—তা কেন! এই তো নীতি সেন এখানে এসে রয়েচেন।

সতীনাথ আশ্চর্য্য ভঙ্গীতে কহিল,—এসে রয়েচেন! তা হলে কথামত কার্য্যই করেচেন তিনি, দেখচি! ভালো!

অনিল কহিল—তা, তিনি বেশ লোক। এত পড়া-শুনা আছে—সত্যি! স্ত্রীলোক যদি লেখাপড়া ভালো করে শেখেন, তা হলে—

সতীনাথ কহিল—কপ্‌চানির একতিল অবসর ঘটতে দেন না—যা বলচো, তার ভাবার্থ এই তো?

অনিল কহিল—না—না।

সতীনাথ কহিল—ভাবার্থ থাক্‌। তুমি একা বসে যে? শ্রীমতীকে পাশে দেখচি না! এই সাগরাম্বুরাশির উদ্দাম নৃত্য—এর গানের তালে তাঁর কণ্ঠের স্বর—

অনিল কহিল—তিনি তাঁর বান্ধবীর সঙ্গে কে সব

আলোচনা করচেন। সকালেই ওঁদের আলোচনা জমে উঠেচে, দেখে এলুম। নীতি সেন তাঁর উপন্যাসের চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ শেষ করেচেন কাল রাত্রে; তাই নিয়ে কি সব মনস্তত্ত্বের আলোচনা সুরু হয়েচে।

সতীনাথ কহিল,—ন চ শুভসূচিতমেতৎ! বিবাহের এই পঞ্চম মাস—এ সময় এমন রমণীয় স্থানে দু'জনের দু দিকে অবস্থান—এ যে পাঁচ বছর পরে ঘটবার কথা! —আমার কথা শোনো, বন্ধু—মধুযামিনী যাপনের জন্য বিজন-বাসেই যখন আশ্রয় নিয়েচো, তখন ওঁর বান্ধবীকে সঙ্গে এনে ভালো করো নি!

অনিল কহিল,—না, না, নীতি সেনের উপস্থিতিতে আমাদের সময় বেশ আনন্দেই কাটচে। একটা বৈচিত্র্য! তা ছাড়া প্রিয়া কি বলেন, জানো?

সতীনাথ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অনিলের পানে চাহিল।

অনিল কহিল,—বলেন, বিবাহ করেচি বলে বন্ধু-বান্ধবকে ত্যাগ করবো কেন?

সতীনাথ হাসিল, হাসিয়া কহিল,—there's the rub. কিন্তু যথার্থ বলো তো—তোমার চিত্তাকাশে এক-

খণ্ড মেঘের উদয় হয়েচে কি না? যখন তুমি প্রিয়ার সান্নিধ্য-কামনায় আকুল, তখন এসে দেখলে যে তিনি নীতি সেনের সঙ্গে দার্শনিক আলোচনায় প্রমত্ত?

অনিল উদাস নেত্রে সুদূর অসীম সাগরের পানে চাহিয়া রহিল,—এ কথার কোনো জবাব দিল না।

রৌদ্র বাড়িতেছিল। নুলিয়ারা আসিয়া বারবার বিরক্ত করিতেছিল,—স্নান করিবে না?

অনিল কহিল,—চলো আমার ওখানে। দেখা করবে না তোমার বান্ধবীর সঙ্গে?

সতীনাথ কহিল,—চলো।

দু'জনে উঠিল। কাছেই 'সুনীল-সায়র' বাঙলা। অনিলের আস্তানা। বাঙলায় ঢুকিয়া সতীনাথ দেখে, সামনের বারান্দায় চেয়ারে বসিয়া দুই সখী। সামনে গোল টেবিলের উপর একরাশ কাগজ ও বই। নীতি সেন তখন শেকভের কথা বলিতেছেন—মাঝে মাঝে টুর্গেনিভের নামটাও সেই সঙ্গে।

সতীনাথ বিরক্ত হইল। বাঙালীর মেয়ে দিবা-শেকভ বেনাভেন্ত্ লইয়া থাকিবে! আর কি কোনো

কথা নাই? এই যে স্বরাজ লইবার জন্য দেশের লোক ভাবিয়া সারা হইয়া যাইতেছে, ডায়ার্কির মাকাল ফল গ্রহণ করিতে বিরূপতায় সকলের প্রাণ ভরিয়া গেল—সে সম্বন্ধে নয় একটা কথা তোলো! তা না—কেবলি শেকভ, বার্গশ, ইবশেন, ইবানেজ্, হ্যামশন্! এদের বাদ দিয়াও সংসার বেশ চলিতে পারে! সতীনাথকে দেখিয়া সুনন্দা দেবী অভ্যর্থনা করিলেন, কহিলেন,—কখন এলেন?

সতীনাথ অভিবাদনান্তে জবাব দিল—কাল রাত্রে।

সুনন্দা দেবী কহিলেন,—কোথায় এসেচেন?

অনিল কহিল,—ভিক্টোরিয়া বোর্ডিংয়ে।

সুনন্দা দেবী অভিমানের সুরে কহিলেন,—আমাদের এখানে কি আপনার এত বেশী কষ্ট হতো?

সতীনাথ কহিল,—অত্যন্ত আরাম হতো, মানি। সেটা হয়তো সহ্য হতো না। তাই। তাছাড়া চল্‌তি একটা প্রবাদ আছে—একে নিদ্রা, দুয়ে পাঠ, তিনে গোল, চারে হাট! তা তিনে গোল বেশ হচ্ছে, দেখচি—আমি এসে জুটলে চার পূর্ণ হয়ে একটা

হাটের পত্তন হবে যে! কথাটা বলিয়া সতীনাথ হাসিল।

এ কথার শ্লেষটুকু অনিল বুঝিল, বুঝিয়া সেও হাসিল! সুনন্দা দেবী বুঝিলেন না, কাজেই চুপ করিয়া রহিলেন। নীতি সেন কহিলেন,—আসুন সতীনাথবাবু, আমরা এক মস্ত সমস্যা নিয়ে পড়েচি। দেখুন তো আপনি যদি···

সতীনাথ কহিল,—মাপ করবেন, সমস্যা দেখলে চিরদিন আমি দূরে সরে যাই। বরং অনিলকে ধরুন—দেশের বহু সমস্যা নিয়ে ও বহুকাল বহু চর্চ্চা করচে।

ঠোঁট ফুলাইয়া অবজ্ঞার ভাব দেখাইয়া নীতি সেন কহিলেন,—তবেই হয়েচে!

অনিল কহিল,—সতী এখানে এসেই থাকবে, সু—?

সুনন্দা দেবী কহিলেন,—নিশ্চয়।

সতীনাথ কহিল,—কিন্তু...

অনিল কহিল,—এর মধ্যে কিন্তু নেই!

সুনন্দা দেবী কহিলেন,—থাক্‌তে পারে না। তাছাড়া নীতি—এঁর সঙ্গে কথা কয়ে প্রচুর আনন্দ পাবেন।

ইনি কাল এঁর 'হতাশ্বাসের হতাশা' উপন্যাসের চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ শেষ করেচেন। তার মধ্যে এত কথা, এত তর্ক তুলেছেন—

নীতি সেন কহিলেন,—কথা তোলা কি—আমি রবীন্দ্রনাথের ethics একদম উল্টে দেবো। জোলা, ইবসেন্ কত বড় ধাপ্পা চালিয়ে গেছেন, সে সব ধরিয়ে দেবো।

কথা শুনিয়া সতীনাথ স্তম্ভিত! অনিল হতাশভাবে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

নীতি সেন কহিলেন,—আমরা ঘরে যাই চলো নন্দা—এঁরা কথাবার্ত্তা কবেন। আমাকে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদটা আজ শেষ করতেই হবে। তোমার সঙ্গে আলোচনা করে—

সুনন্দা দেবী মিনতি-ভরা দৃষ্টিতে সতীনাথের পানে চাহিলেন এবং বিনীত স্বরে কহিলেন,—আমায় একটু মাপ করবেন, সতীবাবু। আপনি বোধ হয় বুঝতে পারচেন, কি মস্ত কাজ আমি হাতে নিয়েচি। নীতির এই পরিচ্ছেদটুকু সুরু হলেই—আপনারা দুজনে ততক্ষণ একটু গল্প-স্বল্প করুন।

সতীনাথ কহিল—বেশ।

সুনন্দা দেবী টেবিলের উপর হইতে কাগজ-পত্র গুছাইয়া লইয়া ঘরের মধ্যে গেলেন, নীতি সেনও সেই সঙ্গে।

অনিল কহিল—ব্যাপার তো চক্ষে দেখলে। সু-কে যাদু করেচে যেন! কিন্তু এ কিসের মোহ? ছাই-পাঁশ লিখতে চাও, নিজে লেখো গে! সঙ্গে সঙ্গে সুকেও টানো কেন?

সতীনাথ কহিল—সমুদ্রতীরে তোমায় একলা দেখে এবং নীতি সেন এখানে ডেরা নিয়েচেন শুনে আমি এই ট্রাজেডি কতক অনুমান করেছিলুম!

অনিল কহিল—আমায় উনি ভাবেন, একদম বর্ব্বর, বুনো! কি অবজ্ঞার চোখেই যে দেখেন। কারণ ওঁর লেখায় আমি কোন উৎসাহ দেখাই না, মনে এতটুকু চাঞ্চল্য তুলি না! আগে আমাকেও লেখা পড়াতেন—আমি হাই তুলতুম। শুধু তো লেখা শোনা নয়, তর্ক চাই, তারিফ করা চাই। তর্ক জিনিষটা আমার ধাতে মোটেই সহ্য হয় না; তাছাড়া ওঁর কি মত,

জানো? আমাদের মত নির্ব্বিকার পুরুষগুলো অর্থাৎ যাঁরা লেখে না এবং ওঁদের লেখার তারিফ করে না, তারা কুকুর-বিড়ালের সামিল! এখন বুঝচি না ভাই, কি করে এ নাটকের যবনিকা পাত হবে! অথচ যবনিকার প্রয়োজন খুব বেশী অনুভব করচি।

সতীনাথ কহিল—কিন্তু এই একটু আগেই যে তুমি তারিফ করছিলে!

অনিল কহিল—পাছে শুনে তুমি ভড়কে যাও, এবং এখানে না আসো, তাই। এখন তুমি এসেচো যখন, আমার গৃহটিকে এবার শান্তির নীড় করে তোলো ভাই! সু-ও থেকে থেকে কি মিনতি-ভরা করুণ দৃষ্টিতে চায় আমার পানে, যেন সে কত-বড় অপরাধী—অবশ্য নীতি সেনের অসাক্ষাতে! কিন্তু সে অবসরও মেলে খুব অল্প! বন্ধু-বান্ধবীর আগে কি স্বামীর স্থান নয়?

সতীনাথ কহিল—আমাদের দেশাচার তাই বলে। তবে, যদি হালের কথা ধরো—জানি না।

অনিল কহিল—বাজে কথা যাক্! সে দিন

আমি একটা গান ধরেছিলুম—গলা বা সুর আমার প্রতি সদয় নয় জানি, তবু মনে কেমন আনন্দ জেগেছিল, তাই! অমনি নীতি সেন এসে সগর্জ্জনে জানিয়ে দিলেন আমার বিশ্রী বেতালা আওয়াজে তাঁর নায়িকার চিন্তার খেই কেটে গেছে! সত্যই যদি তা কেটে থাকে, ও-ভাবে সে কথা বলা কি উচিত ছিল? উনি আমার অতিথি। একটু ভদ্রভাবে বললে পারতেন··· বিদ্রূপের ভঙ্গীতে...! তার উপর চব্বিশ ঘণ্টা মুখের বুলি, শেকভ আর ইবশেন আর গ্যাতিয়ে, আর রোমা রোলাঁ—

সতীনাথ কহিল—ওঁরা ভাবেন, শেকভ, ইবশেন পড়বার সুযোগ ওঁরাই শুধু পেয়েচেন! বিলাতী পাবলিশারদের কল্যাণে ইবশেন-গ্যাতিয়ে যে আমাদের ঘরে ঘরে ঢুকে মাথায় বুকে আসন পেতে বসেচেন, সেদিকে খেয়ালও থাকে না! তা, তুমি এতে রাগ করচো? আমার কিন্তু ভারী কৌতুক বোধ হচ্ছে।

অনিল কহিল—কারণ, তুমি আমার অবস্থায় পড়োনি।

আহারের সময় নীতি সেন ইবসেন লইয়া কথা তুলিলেন। Doll's Houseটা কি? না, নারী পুতুল মাত্র, পুরুষের হাতে খেলার বস্তু! বিবাহ করিয়া পুরুষ ঘর পাতে, আর সে ঘরে তার খেলা চলে নারীকে লইয়া। যেন নারীর প্রাণ নাই, মন নাই, সুখ নাই, দুঃখ নাই! নোরা তা বুঝিল, বুঝিয়া চলিয়া গেল! ছেলেপিলের ভার লইল না। কেন লইবে? ছেলেমেয়ে তো পুরুষের খেয়ালের বস্তু মাত্র।

সতীনাথ কহিল,—মানি না আমি। মাতৃস্নেহ বস্তুটা তবে কি? মার বুকে অত-বড় নিঃস্বার্থ স্নেহ—মা স্বামীকেও অত ভালোবাসেন না, যত বাসেন ছেলে-মেয়েকে। সে স্নেহ...? যার পাশে নিজেকে একেবারে ছেঁটে ফেলেন?

নীতি সেন কহিলেন—ভুল! মাতৃস্নেহ কুসংস্কার মাত্র, অন্ধ কুসংস্কার। বিবাহ যদি কোন নারী একটা ভুলের বশে দৈবাৎ করে ফেলে তো তার উচিত মাতৃত্বের অধীন হয়ে দ্বিতীয় ভুল না করা! মাতৃত্ব-প্রতিরোধ করাতেই তার সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব।

সতীনাথ জলিয়া উঠিল, কহিল—মাপ করবেন মিস্ সেন···

নীতি সেন বলিলেন—মিস সেন নয়। নীতি সেন বলবেন।

সতীনাথ কহিল—বেশ, নীতি সেনই। তা শুনুন, মাতৃত্ব প্রতিরোধ করার নাম জাতি-হত্যা। এত-বড় কুকথা আপনি প্রচার করতে চান? আর তাই নিয়ে উপন্যাস লিখচেন?

নীতি সেন কহিলেন—নিশ্চয়। নারীর সত্ত্বা, নারীর হক্, এ আমি জোর গলায় প্রচার করবো। আজ লোকে সে কথা না শুনতে পারে—কিন্তু পাঁচশো বছর পরে—

সতীনাথ হাসিল, হাসিয়া কহিল—আপনার মাতৃত্ব-প্রতিরোধ-মন্ত্র লোকে নিলে পাঁচশো বছর পরে এই সুবিশাল বিশ্বভূমি সাহারা মরুভূমিতে পরিণত হবে। আপনার উপন্যাস পড়ে আনন্দ-লাভের সৌভাগ্য-অর্জ্জনে পাঠক-পাঠিকার অস্তিত্বও থাকবে না।

অপরাহ্নে অনিল আবার সমুদ্র-তীরে আসিয়া

বসিল। সমুদ্রের জল কালো হইয়া উঠিয়াছে। সতীনাথ কহিল,—কি ভাবচো?

অনিল কহিল,—আজ রাত্রে নীতি সেনের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ সুরু হবে। তার কল্পনা আর আলোচনা চলেছে! সু—চকিতের জন্য আমার কাছে এসেছিল, তার চোখে সেই মিনতি! নীতি সেন তখনি এসে তাকে ডেকে নিয়ে গেল। আজ রাত্রে নীতি সেনের সঙ্গে জেগে বসে সু তাঁকে প্রেরণা জোগাবেন।

সতীনাথ কহিল—বলো কি! এ যে একেবারে fit case for a matrimonial court—Wanted restitution of conjugal rights. এবং তোমার দেখচি অবিলম্বে আদালতের শরণ নেওয়া দরকার।

অনিল কহিল—তামাসা নয়। একটা উপায় স্থির করো—যাতে নীতি সেনের হাত থেকে সু-কে উদ্ধার করতে পারি।

হাসিয়া সতীনাথ কহিল,—আর বান্ধবীর অপ্রীতি আমার উপর—?

অনিল কহিল—না, না। তাঁর চোখে সে মিনতির

দৃষ্টি তুমি ছাখোনি। তিনিও চক্রবাকীর মত বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলচেন। মুক্তি উনিও চান—তবে রূঢ়তা না প্রকাশ পায়, শুধু এইটুকু—

সতীনাথ কহিল,—তা হলে তোমায় ওঁর প্রেমে পড়তে হয়।

অনিল কহিল—স্ত্রীর সঙ্গে? নতুন করে? তুমি বলো কি! প্রেম কি কম আছে এখন যে...

সতীনাথ কহিল,—না, না প্রেম নীতি সেনের সঙ্গে। তামাসা নয়। বান্ধবী, তার নারী—ইবশেন প্রভৃতির চর্চ্চা যতই করুন, অস্থিতে-মজ্জাতে এবং অন্তরে তিনি নারীই আছেন। বান্ধবীও নারী—এ ব্যাপারে সেই সনাতন ঈর্ষানল জ্বলবে! তার পর—

অনিল কহিল,—জীবনটাকে তুমি বইয়ের পাতা বলে ভাবো?

সতীনাথ কহিল—ভাবি। বইয়ের পাতায়ও এত অঘটন ঘটে না—যত ঘটে জীবনে! আজগুবি-কৌতুকেরও অন্ত থাকে না জীবনে! শোনো, ... এসো, ফেরবার সময় ফুলের তোড়া কিনে নিয়ে যাই।

সুযোগ বুঝে নীতি সেনের হাতে 'রোমান্টিকভাবে' তোড়াটি ধরে দিয়ে বলো, আপনার রূপে মুগ্ধ পূজারীর পূজা-উপহার! বাকী খুঁটিনাটিটুকু পথে বলে দেবো।

অনিল কহিল—ধেৎ!

---

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

### শর-কৌতুক

সন্ধ্যার পর একটু সুযোগ ঘটিল। পুণ্যফল বলিয়া একটা কথা আছে। অনিল আজ মন্দিরের ধার ঘুরিরা আসিয়াছিল। জগন্নাথের মন্দির তাই চোখে পড়িয়াছে, কাজেই মন্দির-দর্শনে তার পুণ্যলাভ হইয়াছে! অতএব—

গৃহে ঘটনার বৈচিত্র্য! সুনন্দা দেবী হার্ম্মোনিয়মের সুরে গান গাহিতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গান—খুব আধুনিক। নীতি সেন তন্ময় হইয়া শুনিতেছিলেন। এমন সময় দুই বন্ধু আসিয়া ঘরে ঢুকিল। গান থামিলে অনিল কহিল,—বাঃ, নীতি দেবী গানে মশগুল!

তার কথার সুরে একটা উন্মাদনা ছিল, আবেগের চাঞ্চল্য! এমন ঘটে না। সুনন্দা দেবী বিস্ময়ে স্বামীর পানে চাহিলেন, অনিলের সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই! নীতি সেনের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল। সুনন্দা

স্বামীর পানে আবার চাহিলেন, তার পর সতীনাথের পানে—সতীনাথ যেন কাঠের পুতুল দাঁড়াইয়া আছে! সুনন্দা দেবী ভাবিলেন, স্বামী কি আজ...? এমন তিনি কখনো দেখেন নাই! কচাই নদীর তীরে সেই হাড়ভাঙ্গা কাজের মধ্যে অমন মিশ্র দলেও না...!

অনিল কম্পিত স্বরে ডাকিল,—নীতি—নী—

নীতি সেন চমকিয়া তার পানে চাহিলেন। অনিল গদ্‌গদ স্বরে কহিল,—রূপসী তরুণী সখী, নীতি দেবী, আপনার রূপে মুগ্ধ পূজারীর এই দীন পূজা নিয়ে—কথা শেষ করিবার পূর্ব্বেই প্রকাণ্ড ফুলের তোড়াটা সে নীতি সেনের কোলে নিক্ষেপ করিল।

বিনামেঘে বজ্রপাত, পথে সহসা সর্প দেখা—চমক দেখাইবার উপমায় এমনি কতকগুলা লাগসৈ কথা গল্পে উপন্যাসে চলিত দেখা যায়! কিন্তু এক্ষেত্রে যা ঘটিল, তার সঙ্গে ও কথাগুলার সংযোগ করিলে ব্যাপার কাহাকেও সুস্পষ্ট বুঝানো যাইবে না! নীতি সেন চমকিয়া লাফাইয়া উঠিলেন,—Brute! Idiot!

অনিলের মুখ নিমেষে সাদা হইয়া গেল—যেন

তার মুখে সজোরে কে চাবুক কষাইয়া দিয়াছে! সতীনাথ তাকে টানিয়া কহিল,—ছি! ছি! এ কি পাগল হয়েচো তুমি! বলিয়াই অনিলকে লইয়া নিমেষে সেখান হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সুনন্দা দেবীর মনে হইল, পৃথিবীখানা বুঝি ধূমকেতুর ধাক্কায় ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, এবং তিনিও বাঁচিয়া নাই! কিন্তু সে মুহূর্ত্তের ভ্রম! ধূমকেতুর পৃথিবীর কাছে আসিবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না......

সুনন্দা দেবী ক্রমে বুঝিলেন, পৃথিবী যেমন তেমনি এবং তিনিও বাঁচিয়া আছেন! এবং বুঝিয়া তিনি চোখ তুলিয়া চাহিলেন, চাহিতেই দেখেন, নীতি সেন ঘরে নাই। বাহিরে কাদের বাড়ী গ্রামোফোনে গান চলিতেছিল। গান তাঁর চিরকাল ভালো লাগে। কিন্তু এখন মনের অবস্থা এমন নয়, কাজেই—

তিনি উঠিলেন,—বাহিরে আসিয়া দেখেন, নীতি সেন বাহিরের বারান্দায় সবেগে পায়চারি করিতেছেন। ভয়ে জড়োসড়ো হইয়া তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। নীতি সেন ডাকিলেন,—নন্দা—

সুনন্দা দেবী কহিলেন,—মাপ করো নীতি!

নীতি সেন কহিলেন,—এ কি এ আচরণ! একজন পুরুষ মানুষের এমন স্পর্দ্ধা—এভাবে আমায় প্রেম-নিবেদন…!

সুনন্দা দেবী কহিলেন,—কিছু মনে করো না, ভাই।

নীতি সেন কহিলেন,—আমার পঞ্চদশ পরিচ্ছেদটুকু আজ আর সুরু হবে না—সব গুলিয়ে গেছে। আমি একলা বসে একটু চিন্তা করতে চাই। মনটা কেমন…যাক্, আমায় ডেকো না। নীতি সেন চলিয়া গেলেন।

সুনন্দা দেবী ভাবিলেন, কিসের চিন্তা? এ সুব তাহা হইলে…?

সাম্‌নে জ্যোৎস্না-ভরা আকাশে কে কালি লেপিয়া দিল! সুনন্দা দেবী সিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িলেন—তাঁর চোখে জল ছাপাইয়া আসিল। তিনি উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ! সহসা অঙ্গে কার করস্পর্শ! সুনন্দা দেবী

অশ্রু-ভরা দুই চোখ তুলিয়া চাহিলেন। সে দৃষ্টির সামনে অনিল কাঁপিয়া উঠিল। সুনন্দা দেবী কহিলেন,—কেন ওকে ও কথা বল্‌লে ?

অনিলের প্রাণে মমতা জাগিল। কিন্তু ওদিকে সতীনাথের ভ্রূকুটি! কাজেই অনিল কহিল,—মনের আবেগে বলে ফেলেচি সু—ক্ষণিকের কেমন মোহ!

সুনন্দা দেবী কোন কথা কহিলেন না। তাঁর দুই চোখে জলের পর্দ্দা!

সতীনাথ কহিল,—মনের আবেগ রোধ করতে পারে না, বন্ধুর এই মস্ত দোষ! না হয় নীতি সেনের রূপ ভালোই লেগেচে, তা বলে নিজের স্ত্রীর সামনে ও-কথা তুলে স্ত্রীর মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করা, এবং নীতি সেনকেও লজ্জিত করা…

সুনন্দা দেবীর চোখে জল এবার ঠেলিয়া আসিল।

অনিল কহিল,—তোমায় তো অবহেলা করচি না সু—

সুনন্দা দেবী কহিলেন—না। তাঁর স্বর বাষ্পার্দ্র।

সতীনাথ কহিল—ওটা রোমান্সের অঙ্গ!

সুনন্দা দেবীর বুকে হাতুড়ির ঘা পড়িতেছিল!

তিনি কহিলেন—অন্যায় করেচো! নীতি অতিথি।

সতীনাথ কহিল—কবিরা বলেন প্রেম অত বিচার করে না। উদয়ন রত্নাবলীর প্রেমে পড়েছিলেন—রত্নাবলী ছিলেন মহিষী বাসবদত্তার সখী। এবং এই রত্নাবলীই সাগরিকা-পরিচয়ে...এখানেও পুরী এবং সাগর-তীর ...অর্থ আমি বুঝেচি। তাছাড়া আপনার সান্নিধ্যও বন্ধু এখন পাচ্ছিলেন না! তরুণী রূপসীর ঐ রূপ সামনে, যৌবনের উচ্ছল আবেগ—নিজেকে সম্বরণ করতে পারেনি আর কি! প্রাচীন সংস্কৃতে, বৈষ্ণব সাহিত্যে এবং আধুনিক সাহিত্যে এই পরকীয়া-প্রীতির প্রচুর-প্রগাঢ় ব্যঞ্জনা দেখবেন। এ মনস্তত্ত্ব!...তা তিনি কোথায় গেলেন?

সুনন্দা দেবী কহিলেন,—ঘরে বিশ্রাম করচেন। কারো সঙ্গে দেখা করবেন না।

অনিল কহিল—তাঁর উপন্যাসের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ?

সুনন্দা দেবী কহিলেন—আজ সুরু করতে পারবেন না।

আঃ! অনিলের মনে হইল, আনন্দের আবেগে সে প্রচণ্ড এক চীৎকার তোলে! কিন্তু না! তিনি ঘরে আছেন, বিশ্রাম করিতেছেন। গেঁয়োখালির সতীনাথের পরামর্শ ভিন্ন আর এক পা চলা নয়!

সতীনাথ কহিল,—চিত্তে ওঁর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েচে! সুনন্দা দেবীর চোখে আবার জলের লীলা! তিনি উদাস চোখে একদিকে চাহিয়া রহিলেন। অদূরে করবীর ডালে এক মস্ত বহুরূপী...তাকে দেখিতেছেন? কে জানে!

———

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

### নাট্য-বিকার

সকালে দুই বন্ধুর আবার আলোচনা সুরু সেই সমুদ্র-তীরে।

সতীনাথ কহিল—কালকের খপর কি, বলো ?

অনিল কহিল—বহু মেঘলা দিনের পর সূর্য্যের আলো দেখলে মনে কি ভাব হয়, জানো? ঠিক তাই—মধু বাতা ঋতয়তে মধু ক্ষরন্তি সৈন্ধবঃ—চারিদিক মধুময় !

সতীনাথ কহিল—নীতি সেনের সাড়া-শব্দ পাচ্ছি না তো !

অনিল কহিল—না। অর্থ ?

সতীনাথ কহিল—ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মনস্তত্ত্ব নিয়ে তেমন চর্চ্চা কখনো করিনি—তবে যদি re-action হয় ?

অনিল কহিল—তার মানে?

সতীনাথ কহিল—ওদিক থেকে প্রেমের অর্ঘ্য-ভরা নৈবেদ্য যদি আসে? অনূঢ়া তরুণী...সাহিত্য-চর্চ্চা করেন, এবং রূপের স্তুতিগান শুনেচেন যখন, তখন তা ঘটা বিচিত্র নয়। ও ডাকে এমন কুহক···

অনিল কহিল—বলো কি! তা হলে তো আরো বিপদ!

সতীনাথ কহিল—অতএব এদিককার ঈর্ষানল আরো বেগে প্রধূমিত করা চাই। নীতি সেন যদি প্রণয়-স্পর্শে উচ্ছ্বসিতা হন, তাহলে দেবীকে স্বরাজ্য-রক্ষায় তৎপর হতে হবে—তোমার পাশেই তাঁকে পাবে তাতে। আপাততঃ একখানি পত্র তোমায় রচনা করতে হবে। গোপন প্রণয়-লিপি। বুঝলে? হলা অনসূয়ে—বার্ত্তা বাত্‌লে দেবো। তারপর তার অঙ্ক-বিভাগও নির্ণয় করে দেবো। তা ছাড়া ওঁর সঙ্গে দেখা হলেই তুমি ওঁর পানে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইবে। অপাঙ্গ-ভঙ্গী প্রভৃতি প্রণয়লীলা প্রকট করার বিবিধ ধারা জানো? না জানো, আমার কাছে

কতকগুলো মাসিক পত্র আছে, তাতে প্রাচীন মোগল যুগের এবং ইণ্ডিয়ান স্কুলের আঁকা ছবিতে চোখের বহু ভঙ্গী দেখবে।

অনিল কহিল—ব্যবস্থা বড় কঠিন হচ্ছে।

সতীনাথ কহিল—রোগের যোগ্য দাওয়াই চাই তো! সীতা দেবীকে উদ্ধার করতে শ্রীরামচন্দ্র বিপুল কপিসেনা নিয়ে গিয়ে লঙ্কা ছারেখারে দিয়েছিলেন—তুমিও তোমার প্রিয়ার উদ্ধারে নেমেচো! সে কথা মনে রেখো। নীতির হাত থেকে দেবীকে উদ্ধার করতে যে ব্যবস্থা উচিত হবে, তা কঠিন হলেও করা চাই তো!

অনিল কহিল—কিন্তু এতে যে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। এক অনূঢ়া তরুণীর অনাবিল চিত্ত নিয়ে...

সতীনাথ কহিল,—নিরুপায়! বিষে বিষক্ষয়!

বন্ধুর পরামর্শে অনিল অপাঙ্গ-ভঙ্গীর বিবিধ কৌশল-কশরৎ লইয়া মত্ত রহিল। নীতি সেন গাঢ় কণ্ঠে বান্ধবীর কাছে কহিলেন,—আমি চলে যাবো। আমার

চিত্তে শান্তির অভাব, উপন্যাসের কল্পনা গুলিয়ে যাচ্ছে।...

সুনন্দা নিশ্বাস ফেলিয়া নিরুত্তর রহিলেন।

ওদিকে অনিল বন্ধুকে ত্যক্ত করিতেছিল,—কৈ, যাচ্ছে না তো! অথচ রোজ তিন বার করে নোটিশ জারি করচেন।

সতীনাথ কহিল,—এইবার লিপি ছাড়ো।

লিপি লেখা হইল। সতীনাথ বলিল, এবং অনিল লিখিল,—

আপনি এ কি রূপের আগুন জ্বালিয়াছেন! আমি যে পলে পলে দগ্ধ হইতেছি! এ দাহ অসহ্য!

দেবী, আমি রূপের পূজারী। বিবাহে সুখ পাই নাই। বিবাহ মস্ত ভুল। আমার সে ভুল আমি বুঝিয়াছি। আমার মন আপনার প্রেমের কাঙাল। এ প্রেম কি নিরর্থক হইবে?

আপনার সখী? আদেশ করুন, আপনাকে লইয়া দেশান্তরে যাইব। এত বড় পৃথিবীর মধ্যে একটু নিভৃত কোণ বাছিয়া লইয়া আমরা প্রেমের কুঞ্জ রচনা করিব। প্রাণের কল-গানে সে কুঞ্জ অহরহ মুখরিত রাখিব। সে কুঞ্জে প্রেমের উৎসব চলিবে।

শুধু একবার বলুন,—চলো। এ দীন তখনি আপনাকে বক্ষে বহিয়া কোন্ প্রেমের অমরায় উড্ডীন হইবে। মন আর্ত্ত স্বরে ফুকারিতেছে—তৃষিত তাপিত চিত প্রিয়া হে, তুমি এসো, তুমি এসো!

অনিল হাসিয়া কহিল,—তুমি কি উপন্যাস লেখো ?

সতীনাথ কহিল—লিখি না, তবে লেখবার বাসনা রাখি। তাই অপরের লেখা উপন্যাস থেকে এই সব সরস বুকনি সংগ্রহ করি।

অনিল কহিল,—চুরি ?

সতীনাথ কহিল,—সাহিত্যে চুরি বলে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব আমি মানি না। ঐ হুঁকোর খোল-নলচে বদলাবদলি বলে একটা গ্রাম্য কথা আছে না ? সাহিত্যে সেটা যেমন খাটে...

অনিল কহিল,—বাঃ !

সতীনাথ কহিল,—এই চিঠির এক কাপি তাঁর হাতে পৌঁছে দিতে হবে, আর এক কাপি তোমার বিছানায় ফেলে রেখো—যেন অন্যমনস্ক হয়ে ফেলে গেছ ! তারপর বান্ধবী এক কাপি হাতে নেবেন, তাঁর কৌতূহল জাগবে এবং অপর কাপি ততক্ষণে নীতি সেনের টেবিলে তাঁর মনস্তত্ত্ব সুগভীর গবেষণায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

অনিল কহিল,—এবং প্রিয়া সু-র কৈফিয়ৎ তলব ?

অশ্রু? মান? সেই সঙ্গে নীতি সেনের বিভ্রম? শেষে যদি হৃদয়-ভেদী ট্রাজেডির সৃষ্টি হয়?

সতীনাথ কহিল,—যে-স্ত্রী স্বামীকে ভালো বাসেন, তিনি স্বামীর অবহেলা দেখলে কখনো আত্মহত্যা করতে পারেন না! এ তুমি eternal সত্য বলে জেনো। আর নীতি সেন? এ চিঠির উত্তর পেলে তখন বিবেচনা করা যাবে।...

পরামর্শ-মত কাজ হইল। সতীনাথ সুনন্দা দেবীকে কহিল—আজ বন্ধুবরকে নিয়ে একটু ঘুরে আসি—ভুবনেশ্বর কি আর কোথাও—ওর মনের গতি যদি ঘুরিয়ে দিতে পারি!

সুনন্দা দেবী ম্লান চোখে চাহিলেন। অবিশ্রাম কান্নায় তাঁর চোখের ফুলা তখনো সারে নাই!

সতীনাথ কহিল—ইনি কোথায়?

সুনন্দা দেবী কহিলেন—সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেছেন।

সতীনাথ কহিল—উনিও কি চঞ্চল হয়েছেন? ওঁর আবেগ?

সুনন্দা দেবী কহিলেন—কেমন উদাস ভাব যেন! ভয় হচ্ছে।

সতীনাথ কহিল—তা হলে দুজনকে দু-ঠাঁই করা প্রয়োজন। চোখের আড়ে যদি মনের আড় ঘটে! তা উনি চলে যাবেন বলছিলেন না...?

সুনন্দা দেবী কহিলেন—জানি না।

সতীনাথ চিন্তিত হইল, কহিল—হুঁ!—অতএব দুজনকে দুজনের চোখের আড় করি।

সমুদ্র-তীরে আবার দুই বন্ধুতে বসিয়া প্ল্যান খাটাইতেছিল—হাস্য-কৌতুকে সে প্ল্যান পরিপূর্ণ! সহসা অদূরে উদাসিনীর বেশে—সর্ব্বনাশ! নীতি সেন! উনি বুঝিয়াছেন?

অনিল চমকিয়া উঠিল। অলক্ষে ফ্লাগষ্টাফের ওদিকে সে ছুট্ দিল। নীতি সেন আসিয়া কহিলেন,—আপনার বন্ধু—? তাঁর স্বর গাঢ়।

সতীনাথ ভড়কাইল; পরক্ষণে কহিল,—নেই।

নীতি সেন কহিলেন,—এ সব হেঁয়ালির অর্থ কি?

সতীনাথ কহিল,—জানি না। আমরা বেড়াতে

যাচ্ছি দু'জনে। আপাততঃ ওয়ালটেয়ার।...বোধ হয়, বন্ধুর অবসরের অভাব। ওই ওর দোষ...যখন যা খেয়াল হয়!

নীতি সেন কহিলেন—খেয়াল! এর কৈফিয়ৎ চাই আমি। একজন নারীর চিত্ত-বৃত্তি...সেই ফুল, ওই চাহনি, এই চিঠি...

সতীনাথ কহিল,—আমরা ফিরে আসি, তার পর দেখবো। সতীনাথ চলিয়া গেল।

নীতি সেন দাঁড়াইয়া রহিলেন,—যেন কাঠের তৈরী নিস্পন্দ পুতুল! উড়িয়া-শিল্পীর রচা সুভদ্রার মূর্ত্তি!...

...পরের দিন আবার পুরী।...সেই বাঙলা।

বুকে উদ্বেগ বহিয়া অনিল আসিয়া ডাকিল,—সু—

কোন সাড়া মিলিল না। সে ঘরের মধ্যে ঢুকিল। সুনন্দা দেবী বিছানায় শুইয়া ঘুমাইতেছেন। অনিল তাঁর কপালে হাত রাখিল, কপালে ঘর্ম্মবিন্দু! বক্ষে স্পন্দন অনুভব করিল—ঠিক আছে! ভয়ের কারণ নাই। আঃ! তখন লোভ জাগিল। ধীরে ধীরে তাঁর সূক্ষ্ম রক্তিম ওষ্ঠপুটে—

চমকিয়া স্নুনন্দা দেবী উঠিয়া বসিলেন—তাঁর চোখের কোলে কালির রেখা! সারা রাত্রি তিনি কাঁদিয়াছেন।

অনিলের দুই চোখ জবার মত লাল। কাল ডাক-বাংলায় সারা রাত ছটফট্ করিয়া কাটাইয়াছে, ঘুম হয় নাই!

অনিল কহিল—ইনি কোথায়? তোমার বান্ধবী?

সুনন্দা দেবী চিত্র-করা দুই চোখের দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিলেন! আসিয়াই তাঁর কথা? তাঁর অন্তরে অশ্রুর বাণ ডাকিল! নিমেষে সে জল চোখে আসিয়া দাঁড়াইল। এত জলও চোখে ছিল! অনিলের প্রাণ অশ্রুতে ভিজিয়া উঠিল।

বাহির হইতে সতীনাথ ডাকিল—দেবী—

অনিল কহিল—ছি, কেঁদো না। সতী আসচে।

চোখের জল কি তাহাতে বাধা মানে!

সতীনাথ কহিল—নীতি সেনকে দেখচি না যে! তার স্বরে আশ্বাস! তাকে দেখিয়া সুনন্দা দেবী বল পাইলেন। তিনি কহিলেন—কাল রাত্রে তিনি চলে গেছেন।

—হঠাৎ ?

সুনন্দা দেবী কহিলেন—তিনি খুব রাগ করেচেন। বলেচেন,—এ কৌতুক ? নারীর প্রাণ নিয়ে প্রেমের এ নির্লজ্জ অভিনয় ? আমি কিছু বুঝি না ? সেই Doll's House ? ফুলের তোড়াটা এমনি ...ক করে দেওয়া ? ও চিঠিও অর্থহীন কৌতুক ?

সতীনাথ হাসিয়া কহিল,—তার পর ?

সুনন্দা দেবী কহিলেন,—এটুকু তিনি বোঝেন, যে, তিনি রূপসী নন্। কাজেই একটু সংশয়—তবে তরুণী নারী—

সতীনাথ কহিল,—বন্ধুর স্তুতি গ্রহণ করেও ও-আবেগ-টুকুকে তিনি পরিহাস বলে ভেবেচেন ? সতীনাথ উচ্চ হাস্য করিল।

সুনন্দা দেবী কহিলেন,—কিন্তু এঁর ... চিঠি কাল—তাঁর দুই চোখে জল আবার হু-হু করিয়া ...লিয়া আসিল।

অনিল কহিল—মাপ করো। ও রচনা আ...র নয়। জানোই তো, ও রকম লেখা আমার আসে না।

বিশ্বাস করো। তোমার সঙ্গে বিবাহের পূর্ব্বে কখনো অমন ভাষার ভঙ্গিমায় প্রণয় নিবেদন করেচি আমি? ও রচনা সতীনাথের।

সুনন্দা দেবী কৌতুক-ভরা দৃষ্টিতে সতীনাথের পানে চাহিলেন।

সতীনাথ কহিল—সত্য কথা, দেবী। আপনার ঈর্ষানল প্রজ্জ্বালিত করা ছাড়া বন্ধুকে আ[illegible] কাছে পৌঁছে দেওয়ার অন্য উপায় ছিল না। আপ[illegible] প্রতি নিমেষ মিলনের জন্য বন্ধুর চিত্ত হাহাকার করে ফির-ছিল। অথচ উনিও আপনার সঙ্গ ছাড়বেন না…তাই আমার পরামর্শে সেই প্রণয়-ফুল-নিবেদন, পরে আমার পরামর্শে সেই অপাঙ্গ-ভঙ্গীর ব্যায়াম-কৌশল, এবং আমারি পরামর্শে অবশেষে এই কুহক-লিপি রচনা! এবং আমাদের হাস্য-কৌতুকেই নীতি সেনের সমু[illegible]-তীরে প্রণয়-স্বপ্নের উপসংহার!

সহসা বিদ্যুৎ চমকিলে আঁধার যেমন কাটিয়া যায়, সুনন্দা দেবীর চিত্তের মেঘ তেমনি কাটিল। তাই বটে? সুনন্দা দেবী ভাবিলেন, ঠিক,…তিনি তো

তাঁর স্বামীকে জানেন—তাঁকে স্বামী কত ভালোবাসেন। তাঁর কি এ…তিনি কহিলেন,—আমায় আপনারা ক্ষমা করুন। আমার মন এমন কালো হয়েছিল—

সতীনাথ কহিল—সংসর্গগুণে।...তা তিনি গেলেন কি করে?

সুনন্দা দেবী কহিলেন—তাঁকে বললুম, স্বামীকে হারাতে বসেচি—বান্ধবীকেও সেই সঙ্গে—

সতীনাথ কহিল,—তা নয়! নেপথ্যে ওদিকে এক দৃশ্য যোজনা হয়েছিল,—সমুদ্র-তীরে। সেই দৃশ্যে তিনি অপাঙ্গ-ভঙ্গীর আসল অর্থ—সেটা যে পরিহাস আর কৌতুক, তা জানতে পেরেই চলে গেছেন! না হলে বেশ উদাসিনী-বেশে ছিলেন, রোমান্সের পরিপূর্ণ মাধুরী-মণ্ডিতা হয়ে—এই কৌতুকের জ্ঞান লাভ হবামাত্র পুরী ত্যাগ—psychologyর সঙ্গেও খাপ খায়!

অনিল কহিল—অতএব, আমি মার্জ্জনা পেয়েচি?

সুনন্দা দেবী হাসিলেন—যেন মেঘ-কাটা আকাশে আলোর ঝিলিক! তাঁর মুখে কথা ফুটিল না।

সতীনাথ কহিল—তাতে সন্দেহ নাস্তি!

তিন মাস পরে সুনন্দা দেবী একদিন অনিলকে একটা খবরের কাগজ দেখাইয়া কহিলেন,—ছাখো।

অনিল দেখিল,—কাগজে ছাপা আছে, বেঙ্গল ফিল্‌ম্‌সে বিদূষী মহিলা মিস্ নীতি সেন যোগ দিয়াছেন।

অনিল কহিল,—এ কি আমাদের নীতি সেন ?

সুনন্দা দেবী কহিলেন—নিশ্চয়। এই যে ছবি ছাপা। তার উপর আরো একটু—তিনি শীঘ্র বিবাহ করিবেন; বর,—ঐ ফিল্‌ম্‌স কোম্পানির ডিরেক্টর হরিৎ-বরণ ত্রিপাঠী! এই ছাখো...

কাগজটা টানিয়া লইয়া সংবাদের উপর দৃষ্টি রাখিয়া অনিল কহিল—বাঃ! The right lady at the right place, at last!

---

প্রেমাঙ্কুরের কাহিনী শেষ হইলে সুরেশ বলিল,—এগুলো তো মরীচিকার বিভীষিকায় পরিপূর্ণ। হাস্যের ফুৎকারে এদের পরিণাম তাই শোচনীয় হয়ে উঠেচে! কিন্তু এমন একটি কাহিনী আমি জানি, যেখানে এই নিশির ডাক অন্ধকার-ভরা বুকে চাঁদের রোশনি জেলে

'দিয়েছিল, ধূলির শয্যায় স্বর্ণ-বৃষ্টি করেছিল···অন্ধকার আর দীর্ঘশ্বাসের করুণ সংযোগ সে কাহিনীকে ভারী মর্ম্মস্পর্শী করে তুলেচে।

আমি কহিলাম—বাঃ! এই ঝমঝম্ বর্ষার রাতে একটু দীর্ঘনিশ্বাস, একটু কাতর কণ্ঠস্বর, ছল-ছল একবিন্দু করুণ অশ্রু···সে যে ভারী চমৎকার খাপ খাবে! বলো সুরেশ তোমার আরব রজনীর সে বিভল-করা কাহিনী...

সুরেশ কহিল,—আরব-রজনীর কাহিনী ঠিক নয়। এই সভ্যতার যুগেরই কথা। দু'জাতের প্রাণের কাহিনী, অশ্রুতে রচা···

সুরেশ তার কাহিনী সুরু করিল।

---

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

### নির্জ্জন বাঙ্‌লা

সেবার পূজার ছুটী হইলে এই ট্রামের ঘর্ঘর আর লোকজনের বিষম হট্টগোল-ভরা সহর কলিকাতা ছাড়িয়া কোনো সুদূর পল্লীর বিজন কোণে পলাইবার জন্য যোগীন্দ্র অস্থির হইয়া উঠিল। গৃহিণী বায়না ধরিলেন, পশ্চিমে চলো। তার মানে, লটবহর ঘাড়ে করিয়া নানা অশান্তি আর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি! তার চেয়ে সহর ভালো, কারণ এ বাঁধা বন্দোবস্তে শরীরকে নাড়াইতে হয় না, মনও বহুৎ হাল্‌কা থাকে!

গৃহিণীর বায়না গিয়া অনুযোগে চড়িল, ক্রমে সে অনুযোগ যখন বিষম মানে দেখা দিবার সূচনা করিয়াছে, তখন বিধাতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন। গৃহিণীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ফটিকচন্দ্র আসিয়া বলিলেন,—ওহে যোগীন,

ঝুরিদায় এক কোলিয়ারী নিচ্ছি—জায়গাটা দেখা চাই। একলা যাবো! তাই তোমায় সঙ্গী করবো ভাব্‌চি,—চলো।

গৃহিণীর পানে চাহিয়া যোগীন বলিল,—কিন্তু আমরা যে মধুপুরে কি দেওঘরে যাবো বলে একরকম সব স্থির করে ফেলেচি।

জ্যেষ্ঠ কুটুম্ব একটু হতাশভাবে তাঁর ভগ্নীর পানে চাহিলেন। ভগ্নী কহিলেন,—তা থাক্ না আমাদের পশ্চিম যাওয়া! খরচ আছে তাতে, তা ছাড়া কাজটা পড়ে থাকবে? আগে কাজ, পরে হাওয়া খাওয়া! দাদার সঙ্গেই ঘুরে এসো না! বলছিলে তো, কলকাতা অসহ্য হয়েচে!

এ-কথায় অভিমান যে যোগীনের না হইল, এমন নয়। গৃহিণীর পানে সে একটু বক্রদৃষ্টিতে চাহিল। নিজের উপর মমতা জাগিল। হারে বেচারা স্বামী-জাত!

ঝুরিয়া রাণীগঞ্জের কাছে—রাণীগঞ্জ আর তপসীর মাঝামাঝি জায়গা। একটা বিলাতী কোম্পানি সেখানে কোলিয়ারী খুলিয়াছিল—কি সব কারণে চালাইতে পা...

নাই—খুব দীর্ঘকালের জন্য এখন লীজ দিতেছে এবং যোগীনের জ্যেষ্ঠ কুটুম্ব লক্ষপতি হইবার বাসনায় সেটা লীজ লইতেছে। নানা ফন্দী-ফিকির লইয়া দিবারাত্র সে ঘোরাফেরা করে,—তা কি রেসকোর্স, কি শেয়ার-মার্কেট, আর কি হাইকোর্টের সেল্—কোন ব্যাপারই ফাঁক যাইবার নয়,—কোন্ এটর্নির অফিসে গিয়া কোলিয়ারির লীজ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা এক রকম পাকা করিয়া আসিয়াছে,—শুধু একবার কোলিয়ারির ব্যবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া আসার ওয়াস্তা!

একদিন দুপুর বেলায় দুজনে রওনা হইল। রাণীগঞ্জে পৌছিল সন্ধ্যার একটু পরে।

যাত্রার সময়টা কেমন ছিল দেখা হয় নাই, তবে পথে দুর্গতির সীমা রহিল না। ট্রেণ হইতে নামিয়া ষ্টেশনে একখানিও ঘোড়ার গাড়ী মিলিল না। এগারার দিকে মাঠে এক সার্কাস-কোম্পানি তাঁবু গাড়িয়াছে। দেশের লোক একেবারে ক্ষেপিয়া সপরিবারে সেই সার্কাস দেখিতে ছুটিয়াছে। সার্কাসের পর হইবে যাত্রা। এই বিচিত্র যাত্রাও নাকি ঢাক পিটিয়া সহরময় ঘোষণা

দিয়াছে, এইটাই তাদের শেষ রাত্রি, এবং প্রবেশের মূল্যও সিকি করা হইয়াছে! উদ্দেশ্য, দেশের সকলে এই অপূর্ব্ব কেরামতি দেখিয়া জীবন সার্থক করুক! যাক সে কথা।

ঝুরিদায় যাইতে হইলে ঐ ঘোড়ার গাড়ীই সম্বল—না হইলে অন্ধকার পথ, ঠ্যাঙাড়ের ভয়ও আছে! কাজেই রাত্রির মত দুজনে ষ্টেশনে রহিয়া গেল। আহার যা জুটিল, তা বলিবার নয়।

পরদিন ভোরেই ঘোড়ার গাড়ী লইয়া যাত্রা। ঝুরিদায় গিয়া যখন পৌঁছিল, বেলা তখন ন'টা বাজে।

মাঠের মাঝে চমৎকার বাংলা। ঘরগুলা সাহেবী কেতায় সাজানো—ডিনার-ওয়াগন, ড্রেসিং টেবিল হইতে মায় দেওয়ালের ছবি—কিছুরি অভাব নাই। বাংলার সামনে উদ্যানের কঙ্কাল। যে ব্যক্তি এ উদ্যান সাজাইয়াছিল, সে যে সৌখীন, তাহাতে ভুল নাই। বাংলায় একটা বেয়ারা ছিল,—সে জল তোলা হইতে রান্না-বান্নার কাজে অবধি বেশ পোক্ত।

কুয়া হইতে জল তুলাইয়া গোসলখানায় স্নান

সারিয়া ফিট্‌ফাট্‌ হইয়া বাহিরের বারান্দায় যোগীন একটা ইজিচেয়ারে গা গড়াইয়া দিল। ফটিক স্নান সারিয়া বিস্কুটের টিন বাহির করিল—যোগীন সেদিকে নজরও দিল না। কারণ, ওদিকে বেয়ারার বন্দোবস্তে পাক-কক্ষ হইতে চমৎকার সুগন্ধ বহিয়া আসিতেছিল।

অপরাহ্নের একটু আগে কোলিয়ারির এক বাবু আসিলেন দেখা করিতে। যোগীন ও ফটিক বলিল,—আজ বিশ্রাম,—কাল থেকে দেখা সুরু করবো। তার পর যোগীন নানা সংবাদ সংগ্রহে ব্যস্ত হইল।

কুঠী আর কোলিয়ারী এক কালে জোন্‌স্‌ সাহেবের ছিল। জোন্‌স্‌ মারা গিয়াছে। তার মেম বিলাত চলিয়া গিয়াছে—এটর্ণির উপর ভার দিয়া গিয়াছে, এ সব ভাড়া দিবার জন্য। বাবুটী আরো বলিলেন, সাহেব ছিল ভারী সৌখীন। আর যখন প্রথম এখানে আসে, তখন সে একেবারে তরুণ যুবা; বিবাহ হয় নাই। এদিকে সৌখীন লোক, ওদিকে আবার কাজেও তেমনি দড়। কিছুকাল থাকিবার পর সাহেবের ভারী প্রণয় জন্মিল এক কুলির মেয়ের সঙ্গে। মেয়েটির নাম নিশি।

# নিশির ডাক

নিশির রঙ মিশ্ কালো। তা হইলেও দেখিতে এমন সুশ্রী যে তার পানে দৈবাৎ চোখ পড়িলে দৃষ্টি খানিকক্ষণ আট্‌কাইয়া থাকিবেই! বয়স অল্প, যৌবনের উছল স্রোত তার সর্ব্বাঙ্গে যেন মৃদু তরঙ্গে বহিয়া চলিয়াছে, সর্ব্বক্ষণ! আর তার চোখ—অমন চোখ চট্ করিয়া [illegible] পড়ে না! এ ব্যাপারে আর যাই হোক, সাহেবের রুচির দোষ কেহ দিতে পারে নাই। কালোর মধ্যেও কেমন আলোর দীপ্তি ফোটে, তা যে নিশিকে দেখিয়াছে, সেই বুঝিবে। তারপর সাহেবের সঙ্গে এমন [illegible] খাইয়া গেল যে ঐ কুলির মেয়ে নিশি হইল মেম-সাহেব, আর এই এত বড় কোলিয়ারির মালিক। তার কথায় লোক-জনের চাকরি হইত, চাক্‌রি যাইত, অর্থাৎ যা করিবে নিশি মেম-সাহেব! সকলে তার নাম দিয়াছিল, নিশি মেম-সাহেব। তবে তার এ সৌভাগ্যে কাহারো হিংসা হয় নাই! তার কারণ, নিশি মেয়েটী মুখে এমন হাসির দীপ্তি ফুটাইয়া রাখিত যে তার উপর কাহারো রাগ হইত না—আর তার মন ছিল, জলের কোলে পদ্মফুলের মতই ঢলঢলে! সতেজে সবাইকে ছাড়াইয়া সবার উপরে

মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইবে...চারিদিকের প্রতি দারুণ অবজ্ঞা লইয়া, এমন মন তার ছিল না!

তারপর কোথা হইতে কি যে হইল! অন্য সাহেবরা চটিয়া গেল জোন্‌সের উপর—একটা কালা নিগারের মেয়ের সঙ্গে এই ব্যাপার! সকলে জোর করিয়া জোন্‌স্‌কে বিলাতে পাঠাইয়া দিল এবং এক বৎসর পরে সাহেব ফিরিল মেম লইয়া। নিশি তারপর রাগে কি করিয়া যে জোন্‌স্‌কে মারিয়া ফেলিল, তা সে-ই জানে! জোন্‌সের মরার রহস্য চিরদিনের জন্য অজানা রহিয়া গেল! আর নিশিও সেই দিন হইতে ফেরার!

মেম সাহেব বিলাতে চলিয়া গেলেন—সে আজ প্রায় এক বৎসরের কথা। তারপর এ বাঙলা আর একটা সাহেব লইয়াছিল—তার কেমন আতঙ্ক জন্মিল! বলে, বাঙলায় ভূত আছে! ছ'মাস পরে সে পাততাড়ি গুটাইল। তারপর সাহেবরা আর কেহ কোলিয়ারি লইতে আসে না। তা আপনারা......?

যোগীন বলিল,—ভূত আছে? তা হলে আজ

রাত্রিটা কাটবে ভালো। এই ভূতকে দেখার কামনা চিরদিন এমন প্রবল, অথচ তার দেখা কোথাও কখনো মেলেনি।

ফটিক বলিল,—ভূতের ভয়ে বাঙলা ছাড়চি না! এখন বুঝচি, এটর্নির অফিসেই আমায় তারা কেন বললে, পাঁচদিন, কি সাতদিন কি পনেরো দিন অবধি সেখানে গিয়ে থেকে দেখুন—তারপর লেখাপড়া রেজেষ্ট্রী!......সেটা এই ভৌতিক ব্যাপারের জন্য? বটে! তা,......মোদ্দা আপনারা কেউ ভূত-টুত দেখেচেন কখনো?

বাবু বলিলেন,—কৈ, দেখিনি তো মশায়। একবার এধারে সব ডুবে গেছলো—তা ছেলেপিলে নিয়েও থেকেচি অমন একমাস—ভূত টুত দেখেনি কখনো। বেয়ারাটীকে প্রশ্ন করিতে সে বলিল,—ওসব মিছা কথা। সে তো কোন ভয় পায় নাই কখনো! একলা থাকে, এই নিরালা মাঠের মধ্যে নির্জ্জন বাঙলায়......

---

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

### নিশির স্বপ্ন

যোগীন্দ্র বই বন্ধ করিয়া শুইয়া ঐ জোন্স আর নিশির কথা ভাবিতেছিল। ফটিক ভূত দেখিবে বলিয়া একখানা মোটা নভেল খুলিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু আধ ঘণ্টা পরেই এমন নিশ্চিন্ত নিদ্রাসুখের সঘন পরিচয় দিল যে প্রকাণ্ড সম্ভাবনা চলিয়া যায় ভাবিয়া যোগীন্দ্র ডাকিল,—ওহে, শুনচো ?

জবাব না মিলিতে চাহিয়া যোগীন দেখে, ফটিক পরম আরামে ঘুমাইতেছে !

অপরাধ কি ? কাল হইতে যে ধকল গিয়াছে ! তখন যোগীন চিন্তার জট খুলিয়া দিল ! এই নিশি, হয়তো বেচারী বড় দাগা পাইয়াছিল সাহেবের ওই বিশ্বাস-হীনতায় ! চোখে একদিকে এই বিশ্বাসহীনতা, আর অন্যদিকে নবপ্রেমের রঙীন লীলা দেখিয়া এক

দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে হয়তো এমন বিষ দিয়াছিল যে সাহেবের সব শেষ হইয়া গিয়াছে ! তারপর ভয়ে বেচারী কোথায় সরিয়া পড়িয়াছে !

এমনি চিন্তার পর চিন্তা তার মাথাটাকে তোলপাড় করিয়া দিল। যোগীন ভাবিল, না জানি, সে কেমন ছিল ! কালো ? তবু এ কালো রঙে একটা তরুণ গোরাকে [illegible] মুগ্ধ রাখিয়াছিল ! আর অঙ্গে তার যৌবন না [illegible] কি সুষমাই ফুটাইয়া তুলিয়াছিল ! কি জৌলুষ, কি [illegible], কি লাবণ্য ! চিন্তার টুকরাগুলা ক্রমে জমাট বাঁ[illegible] মনের মধ্যে একটা মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিল—সে একেবারে তরুণ যৌবনের মানসী প্রতিমা !

হঠাৎ মৃদু কণ্ঠে কে ডাকিল,—বাবুজী—

চমকিয়া চাহিয়া যোগীন্দ্র দেখে, দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া এক তরুণী ! রঙ কালো, কিন্তু মুখ-চোখ…দু' দণ্ড চাহিয়া দেখিবার মত ! অপূর্ব্ব !

চট্ করিয়া যোগীন্দ্র কোনো জবাব দিতে পারিল না। মুগ্ধ নয়নে তার পানে চাহিয়া রহিল। সে আবার ক[illegible] কহিল, ডাকিল—বাবুজী—

যোগীন উঠিয়া বসিল। তার সারা অঙ্গ ছম ছম্ করিতেছিল। মুখে কোন কথা ফুটিল না।

তরুণী আগাইয়া আসিল, মৃদু হাসিয়া পাশে একটা চেয়ারে বসিল। তার হাসিতে যেন একরাশ জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে—তেমনি মিঠা, তেমনি স্নিগ্ধ! চোখে তার রাজ্যের স্বপ্ন জাগিয়া আছে! হাসিয়া তরুণী বলিল,—আমি নিশি। মরিনি বাবুজী, বেঁচে আছি।

যোগীনের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। ভূত দেখিবে বলিয়া জাগিয়া বসিয়া আছে—আর সাম্‌নে সেই ভূত আসিয়া বলে,—আমি বাঁচিয়া আছি, বাবুজী! সে ভূত আবার এক তরুণী নারী! তাকে দেখিয়াও ে মাঞ্চ! তার লজ্জা হইল। জোর করিয়া সে কথা ক হল, বলিল,—তুমি বেঁচে আছো?

হাসিয়া সে বলিল,—হাঁ!......এই দেখুন......বলিয়া সে যোগীনের হাতখানা চাপিয়া ধরিল। কালো পাথরের নয় তো! মৃত্যুর হিম তার তপ্ত রক্ত-স্রোতে কোথাও জমাট বাঁধাইতে পারে নাই! জীবনের আবেগ তপ্ত

রক্তের তালে তালে বেশ বহিয়া চলিয়াছে। যোগীনের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল,—তারপর কেমন যেন আচ্ছন্নের ভাব,—একটা মোহ, একটা নেশা মুহূর্ত্তে যোগীন্দ্রকে জড় নিস্পন্দ করিয়া দিল! কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য!

আবার তরুণী কথা কহিল, বলিল,—দেখলেন তো?

যোগীন্দ্র বলিল,—হঁ্যা...তারপর ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিল,—তা, এখানে এ সময়...?

বাধা দিয়া তরুণী বলিল,—কেন এসেচি, এই কথা বলচেন? আমি রোজ আসি...। আজ দেখলুম, ঘরে আলো...! কে এলো—কোনো সাহেব কি না, তাই দেখতে এসেচি। তা দেখচি আপনারা। বাবুজী—

যোগীন্দ্র অবাক হইয়া তার পানে চাহিয়া রহিল। মনে সন্দেহ হইল, সে জাগিয়া আছে তো? না, এ স্বপ্ন দেখিতেছে?

পরক্ষণে বুঝিল, না, এ তো স্বপ্ন নয়। ঐ যে তার ঠিক সামনে বসিয়া .....

তরুণী বলিল,—বড়বাবু যা বলছিলেন, সে কথা ঠিক নয়। আমি সাহেবকে মারিনি।

যোগীনের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এ কেমন করিয়া জানিল, আমাদের সে কথা? এ তো......

নিশি বলিল,—আমি জানি সব। সবাইকেই ঐ কথা বলে বড়বাবু। কিন্তু তা ঠিক নয়। কাকেই বা বলবো আসল কথা? সাহেবরা তো বুঝবে না...আর বাবুরা? ওদের কাছে একদিন মনিব ছিলুম, আজ এ দুঃখের কথা জানিয়ে দরদ মেগে ফল!

যোগীনের তখনকার মনের ভাব প্রকাশ করিবার নয়! একবার মনে হয়, এটা আগাগোড়া স্বপ্ন দেখা চলিয়াছে—আবার পরক্ষণে চমক ভাঙ্গে, ভাবে, স্বপ্নের মত এলো-মেলো নয় তো! এর মধ্যে বেশ একটা শৃঙ্খলা রহিয়াছে! এই নিশি···

নিশি বলিল,—তবে শুনুন আমার দুঃখের কথা। শুনবেন...?

যোগীন সাগ্রহে বলিল,—বলো।

নিশি বলিল,—সাহেব আমায় রাজ্যেশ্বরী করিয়া তুলিল। অন্য সাহেবগুলার চোখ টাটাইল। কিন্তু আমাদের যে ভালোবাসা···বাবুজী, সে তুমি বুঝিবে

না। তেমন ভালো জগতে আর কেহ কাকেও কোন দিন বাসে নাই, বাসিতে পারে না…

তোমরা পণ্ডিত লোক, তোমরা বিদ্রূপ কর—সূর্য্যকে চায় জলের ফুল, পদ্ম! কিন্তু কোথায় সূর্য্য...কত বড়, সে কত উঁচুতে, আর কোথায় কত নীচে পাঁকে-ভরা মলিন জলের কোলে এতটুকু পদ্ম! তবু দু'জনের কি ভালোবাসা! আমি বুঝিয়াছিলাম, এ ভালোবাসা কত খাঁটী!

সাহেব আমায় একটু না দেখিলে কেমন হইয়া যাইত—আমারো তেমনি হইয়াছিল! বাবুজী, গোপনে ভগবানকে সাক্ষ্য রাখিয়া আমরা পরস্পরকে বিবাহ করিয়াছিলাম। সাহেব বলিয়াছিল, জীবনে কখনো সে আমায় ছাড়িবে না। আমি কত ছোট, মুখে কিছু বলি নাই,—কিন্তু প্রাণটা ঐ কথা বলিবার জন্যই আছড়া-পিছড়ি খাইয়া মরিত! সাহেবের পানে চাহিয়া চুপ করিয়া থাকিতাম—দু' চোখে এত জলও ঝরিত!

কিন্তু একটা দিক দিয়া এমন ঝাঁজ আসিতেছিল.. সাহেব জানিত না, আমি জানিতাম।—এখন মনে ...

কেন সে কথা সাহেবকে বলি নাই! তা হইলে আজ তো এমন করিয়া পস্তাইতাম না!

নিশি চুপ করিল। তার পর স্তব্ধ থাকিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আবার সুরু করিল—ঐ রতনা—সে কুলির ছেলে। সে হতভাগা আমার জন্য বুক ফাটিয়া মরিতেছিল। ছেলেবেলায় আমার খেলার সঙ্গী ছিল—ওর বাপ-মা আমার বাপ-মাকে বলিত, রতনার সঙ্গে আমার বিবাহ দিবে! আমিও রতনাকে ভালো বাসিতাম—কিন্তু সে আর-এক ভাবে! তবু রতনা মরিয়াছিল! আমি কি ছাই তা বুঝিয়াছিলাম! সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতাম, ফিরিতাম। রতনা দলে মিশিয়া বেশ কাজ করিতেছে, যেই আমি কাছে আসিলাম, অমনি কোথায় গেল তার কাজকর্ম্ম, লজ্জা ভয়! কেমন এক দৃষ্টিতে যে সে আমার পানে চাহিয়া থাকিত! অনেক দিন দেখিয়া দেখিয়া তার এ দৃষ্টির মানে বুঝিলাম! দুঃখ হইল। বেচারা রতনা! কেন সে অমন করিয়া চায়? আমি তো ওভাবে উহার পাশে যাই নাই কোনদিন! তবে, আমার খেলার সাথী, ভাই, বন্ধু ও!...দু'একদিন আড়ালে

বুঝাইবার চেষ্টাও করিয়াছি। কিন্তু ও কিছুতেই তা বুঝিবে না!

শেষে সাহেবের দল চক্রান্ত করিয়া জোন্সকে বিলাত পাঠাইল। যাইবার সময় সাহেব সে কি কান্নাই কাঁদিল! আমাকে ছাড়িয়া যাইবে না! আমি বলিলাম,—না, ছি, আমার জন্য দেশ, আত্মীয়-স্বজন, সমাজ, বন্ধু—সব খোয়াইবে! এখানে তো এই দশা! তবু এখানে কটাই বা সাহেব, আর সেখানে তোমার ভাই বন্ধু চারিদিকে। আরো বলিলাম, তোমার আশায় এখানে থাকিব, তুমি শীঘ্র ফিরিয়া এসো!

যাইবার দিন সাহেব কি কাতরভাবে চাহিয়া রহিল আমার পানে,—দুই চোখ জলে ভরা! যাইবার সময় আমার এই কালো ঠোঁটে, বাবুজী...

নিশি কাঁদিয়া ফেলিল। যোগীনের বুকের মধ্যে কি একটা এমন দোলা দিল যে, দম বুঝি তার বন্ধ হইয়া যায়! নিশির দুই চোখ ঝক-ঝক করিতে লাগিল। সে বলিল,—সে ফুল বাবুজী, সে ফুল! আমার মনে হইল, আমি কালো কুলির মেয়ে নই, কয়লার মাটীতে আমার ...

নয়—আমিও ফুল, বাগানের ঐ টক্‌টকে লাল গোলাপের মতই। সে-চুমায় আমার অঙ্গের কালো খোলসটা কোথায় যে খসিয়া ঝরিয়া গেল!

নিশি চুপ করিল। তারপর আবার একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, -তারপর আর কি! বড় দুঃখেই একা দিন কাটিত! সাহেব চিঠি দিত বাঙলায়। বাঙলা সে কষ্ট করিয়া শিখিয়াছিল,—আমাকেও পড়িতে শিখাইয়াছিল। বই পড়িতাম, কত কথা শুনিতাম—রাজ-রাজড়ার কথা! বিলাতের রোমিওর কথাও সাহেব আমায় শুনাইয়াছিল!

রতনা বাঙলার ধারে মাঝে মাঝে আসিয়া দাঁড়াইত—কি যেন বলিবে, চোখের দৃষ্টিতে একরাশ বেদনা, একরাশ কথা ভরিয়া! তাকে তা বলিবার অবকাশও দিতাম না। তাকে দেখিলেই চোখ ফিরাইয়া সরিয়া আসিতাম!···

তারপর একদিন হঠাৎ আমার জ্বর হইল। টাকা-কড়ি সব আমার হাতে, আমিই মালিক। দরদ জানাইয়া ঐ বড়বাবুই ডাক্তার আনাইল। ক'দিন যেন আচ্ছন্ন

ছিলাম। যেদিন চোখ মেলিলাম, চোখ মেলিতে দেখি, পায়ের কাছে বসিয়া রতনা! গা-পা টিপিয়া দিতেছে! চোখের দৃষ্টি তার আমার পানে! চোখ বুজিলাম। যখনই চোখ মেলি, দেখি, রতনা তেমনি একভাবেই আমার পানে চাহিয়া বসিয়া।

আমি ডাকিলাম,—রতন।

কি আগ্রহে সে আমার পানে চাহিল, আজো মনে আছে! সে যেন সে-দৃষ্টি দিয়া আমার বুকে একটা বেদনা-মাখা দুরাশার ছবি আঁকিয়া দিল! তার দৃষ্টিতে বুকের রক্ত মিশাইয়া কি যেন আখর লিখিল! আমার গায়ে সে দৃষ্টি, সে আখর যেন আগুন ছিটাইল।

তারপর একদিন দুই পা জড়াইয়া কি কান্না কাঁদিল! আমার দুঃখ হইল, আহা, বেচারা, বেচারা! তাকে বুঝাইয়া দিলাম, সাহেব আমার স্বামী,—তুমি আমার ভাই যে, ছি! কাঁদিয়া সে লুটাইয়া পড়িল—আমি সেখান হইতে সরিয়া গেলাম।

প্রায় তিন মাস আর সে কাছে নয় দূর হইতে আমা দেখিত। চোখে চোখ মিলিলে সরিয়া যাইত। তার-

পর একদিন হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল,—ক্লাবে সাহেবরা আমোদ করচে নিশি। তোর সাহেব মেম বিয়ে করেচে—শীগ্‌গির এসে পৌছুবে মেম নিয়ে!

আমার চোখের সাম্‌নে তুনিয়াখানা সরিয়া কোথায় যে ডুবিয়া গেল! পা টলিয়া উঠিল। আমি বসিয়া পড়িলাম। যখন হুঁশ হইল, তখন চারিদিকে রাত্রির অন্ধকার, মাথার উপর এক-আকাশ নক্ষত্র, আর পায়ের কাছে মৌন মুগ্ধ রতন!

কথাটা ঠিক—জানিলাম, পরের দিন। ক্লাবেরই এক সাহেব আসিয়া হিন্দীতে জানাইয়া দিয়া গেল, আয়া যেন বাঙলা ঠিক রাখে,—মেম-সাহেবকে লইয়া সাহেব আসিয়া পৌছিবে তু'-চারদিনের মধ্যে। তাঁরা কলিকাতায় আসিয়াছেন। বড়বাবু একটু পরে বেশ ব্যঙ্গ-ভরা সুরে সে-হুকুম চট্‌পট্‌ তালিম করিতে বলিয়া গেল। আরো বলিল, সাহেবের চিঠি আসিয়াছে, নিশি যেন বাঙলা ছাড়িয়া যায়!

সন্ধ্যার অন্ধকারে বাঙলা ছাড়িয়া গেলাম। সমস্ত প্রাণ তুম্‌ড়াইয়া লুটাইয়া পড়িতেছিল! দিনের বেলার অত

আলো...সেও যেন বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছিল! গায়ে ফোটে! তাই সন্ধ্যাবেলায় বাঙলা ছাড়িলাম। একে-বারে লোকালয় ছাড়িয়া চলিয়া গেলাম বনের ধারে। খুব দূরে এক বিজন প্রান্তে। মরিব বলিয়া গলায় ফাঁশ টানিতে ছিলাম! হাত কে চাপিয়া ধরিল। বলিলাম—কে? জবাব হইল,—আমি রতন। বিরক্ত হইলাম। আঃ, এখানেও······এখনো!

মরা হইল না। রতন একটু আশ্রয় করিয়া দিল। ভাবিলাম, একবার সাহেবের লাল ফুল দু' চোখে দেখি! লুকাইয়া বাঙলার ধারে যাইতাম, ছদ্মবেশে, ভিখারিণীর সাজে! আঃ, বাঙলায় কি আমোদ চলিত! বাজনা চলিয়াছে, সামনের ঐ বাগানে জাল খাটাইয়া বল লইয়া মেমকে লইয়া খেলা,—ঘোড়ায় চড়িয়া দু'জনে বেড়াইতে বাহির হওয়া,—তাছাড়া গাছের আড়ালে পাতা-ঝরা বনের প্রান্তে প্রেমের সে কি গুঞ্জন! একদিন আমারি মত মেমের দুই ঠোঁটে···আমার বুকে কে যেন ছুরি টানিয়া দিল!

রতন আসিয়া কত দুঃখ জানাইত; সাহেব-মেমের

প্রেমের কত গল্প করিত। চুপ করিয়া শুনিতাম। এক-দিন সে বলিল,—এবার আমায় নাও।

হুঙ্কার দিয়া আমি বলিলাম,—খবর্দ্দার! রতন ভড়-কাইয়া সরিয়া গেল।

শেষে আর পারিলাম না। একদিন সকালে উঠিয়া ভিখারিণী সাজিয়া বাঙলায় আসিয়া দাঁড়াইলাম—সাহেব একটা বন্দুক সাফ করিতেছিল। আমি সামনে গিয়া সেলাম করিয়া ডাকিলাম,—সাহেব—

সাহেব হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। আমি বলিলাম,—আমায় চেনো? আমি নিশি!

সাহেবের মুখ মরার মত সাদা হইয়া গেল। সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া পকেট হইতে একখানা দশ টাকার নোট লইয়া আমার গায়ে ছুড়িয়া দিল। নোটখানা আমি হাতে পাকাইয়া ছুড়িয়া মাটীতে ফেলিয়া দুই পায়ে সেটা চাপিয়া ধরিলাম! রাগে দুঃখে অপমানে ক্ষোভে আমার চোখে-মুখে কি যে বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল!

সাহেব আস্তে আস্তে সরিয়া বাঙলার ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল—আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

'কতক্ষণ, বলিতে পারি না। হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বরে ফিরিয়া দেখি, সাহেব-মেম হাত ধরাধরি করিয়া এই বারান্দায়... চুমা—চুমার পর চুমা···! সারা দুনিয়া বুঝি ঐ চুমার ধারায় ওরা ঢাকিয়া দিবে!

আমার মনে কে যেন আগুন ধরাইয়া দিল। আর এধারে নয়! সেই দিনই—তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে—ঘরে পড়িয়া আছি, অন্ধকারে আকাশ-পাতাল কত কি ভাবিতেছি—হঠাৎ দম্‌কা হাওয়ার মত রতন আসিয়া হাসিয়া উঠিল, হাঃ হাঃ হাঃ! আমি চমকিয়া উঠিলাম—ও কি ও রতন!

রতন হাসিয়া বলিল,—সব শেষ। তোর যেমন হেনস্থা, তার তেমনি শোধ নিয়েচি!

তার পানে চাহিলাম,—এর মানে?

রতন বলিল,—দুপুর বেলায় সাহেব শীকার থেকে ফিরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল—আমায় দেখে জল চাইলে। সেই জলে মিশিয়ে দিলুম বিষ-পাতার রস—এতটুকুন্! সাহেব জল খেয়ে, তারপর বাঙলায় চলে গেল। এর থামিয়া রতন আবার বলিল,—তারপর যা ভেবেছিলুম,

তাই! সাহেব এসে বাংলায় খাওয়া-দাওয়া করে বললে, ঘুমুবো। ঘুমুলো। সে ঘুম আর ভাঙলো না!...ভাঙবে না! আমার গুরুর দাওয়াই! মারবো, কবে থেকে ভাবছিলুম—কিন্তু তোকে তো পাবার আশা ছিল না।... এখন? যেমন তোকে দাগা দিয়েচে, তেমনি—

—শয়তান! বলিয়া বাঘের মত তার ঘাড়ে আমি লাফাইয়া পড়িলাম। এই দুই হাতে তার টুঁটি চাপিয়া ধরিলাম—শরীরে তখন বাঘের বল আসিয়াছিল। সে একবার একটা আর্ত্তনাদ তুলিল। তারপর, সব চুপ! আমারো কেমন ধাঁধার মত ঠেকিল—আঁধার-ভরা ঝাপ্‌সা চোখের সাম্‌নে হইতে সে-রাত্রে আকাশের অমন যে মস্ত বড় চাঁদ, অসংখ্য তারা, সে সব কোথায় মিলাইয়া গেল!

যখন আবার চোখ চাহিলাম, দেখি—সামনে পড়িয়া রতনের ধড়খানা! সব কথা মনে পড়িল। বাঙ্‌লার দিকে ছুটিলাম। ভারী ভিড় সেখানে! তার পাইয়া দূর-দূরান্তর হইতে মোটর-গাড়ী ছুটাইয়া ডাক্তার আসিয়াছে, দল বাঁধিয়া!

কিছু না,—কিছু না—সব শেষ হইয়া গেছে। দু'দিন পরে সাহেবের গোর হইল বাঙলার কোণে, ঐ গোলাপ ঝাড়ের মধ্যে। মেমের কি কান্না! উঃ—আমার প্রাণ যেন ফাটিয়া গেল। সকলে বলিল, সেই নিশিই সাহেবকে মারিয়াছে হিংসায়!

এই বেদনা, এই শোক, তার উপর ওই সন্দেহ! ঘৃণায় লোকালয় ত্যাগ করিলাম। তবে পারি না—সন্ধ্যার সময় ঐ গোলাপ-ঝাড়টায় আসিয়া বসি,—কি আরাম পাই! চোখের জলে গোরের পাথর ভিজাই!...আমার দয়িত, আমার প্রিয়তম—নির্জ্জনে বনের কোলে কত কথাই কই!...কি যে সান্ত্বনা, কি আরাম! বলি, প্রিয়তম, নাথ, আমিই পড়িয়া আছি তোমার পদপ্রান্তে—কোথায় গো, কোথায় তোমার সে নব প্রণয়িণী?...বাবুজী, প্রাণটার মধ্যে কি যে হয়। মরিতে সাধ হয় না। এখানে তাকে তবু প্রাণের কাছে পাই! এই সন্ধ্যায়, এই রাত্রে—দু'জনে থাকি, একসঙ্গে। মরিলে যদি গিয়া দেখি, সেই মেম তার সঙ্গে আছে! ওঃ! তাই আমি মরিতে পারি না!

নিশি চুপ করিল। যোগীনও চুপ,—নিশির পানে

চাহিয়া। হঠাৎ নিশি ঢলিয়া পড়িল। যোগীন ডাকিল,—নিশি—

কোন সাড়া নাই।

আরো জোরে ডাকিল—নিশি—

ঠেলা দিল,—নিশি—ও নিশি—কি হচ্ছে? হঠাৎ বিষম ঠেলা খাইয়া জাগিয়া দেখে, ফটিক!

ফটিক বলিল,—কি হচ্ছে ও? নিশি! নিশি! নিশিকে পেলে কোথায়? সবে এখন সন্ধ্যা—এখনো আলো রয়েচে! নিশির আসার দেরী একটু আছে।

যোগীন অপ্রতিভ হইল। সংক্ষেপে ব্যাপারটা বলিল। শুনিয়া ফটিক হাসিয়া খুন! বলিল,—বড় বাবুর গল্প শুনতে শুনতে তুমি তো ঘুমিয়ে সারা—দিব্যি নাক ডাকাতে স্থরু করলে! ভদ্দর লোক কত গল্প করে এইমাত্র গেলেন। আমি উঠে চা তৈরী করলুম। তোমার পেয়ালায় চা ভরচি, এমন সময় শুনি, তুমি চেঁচাচ্ছ, নিশি, নিশি! তাই ঠেলা দিলুম! নাও, ওঠো, চা তৈরী—

ধড়মড়িয়া যোগীন উঠিয়া পড়িল। মুখ-হাত ধুইয়া চায়ের পেয়ালা মুখে তুলিল। তবে বুকে একটা ধাক্কা লাগিল, এই যে···এতক্ষণ... !

# তৃতীয় অধ্যায়

## সূচনা

কাহিনী শুনিয়া গিরিজা হাসিয়া কহিল,—আষাঢ়ের গল্প শ্রাবণ মাসে চালালে, বন্ধু !

মণিলাল কহিল,—আর্টিষ্টিক্ টচ্ দিয়েচো যোদ্দা।…এ তো গল্প, তাছাড়া নিশির কাহিনীটুকু রোমান্সের স্বপ্নে ভারী উপভোগ্য।…কিন্তু আমি একটা সত্য কাহিনী বলচি, শোনো…তাতে দেখবে, এই প্রেমের স্পর্শে যথার্থ যে মানুষ, সে কত বড় ত্যাগ স্বীকার করতে পারে !

আমি বলিললাম,—বলো…

মণিলাল কহিল,—শোনো তোমরা…

---

# প্রথম পরিচ্ছেদ

## নূতন যাত্রী

কেশব চক্রবর্ত্তী কাশীর এক গলির মধ্যে বাস করে। তার বাড়ীতে যাত্রী-নিবাস। দু'চার ঘর তার বাঙালী যজমান আছে, তার উপর যাত্রী ধরিয়া তাদের বাস। আর আহার জোগাইয়া আরও যা কিছু উপার্জ্জন করে, তাতেই তার সংসার চলিয়া যায়। সংসারে তিনটি-মাত্র প্রাণী,—সে নিজে, তার স্ত্রী, আর একটি মেয়ে, সোহাগী। সোহাগীর বয়স তের-চৌদ্দ বৎসর; সোহাগীর বিবাহ হয় নাই।

সেদিন সকালে কেশব ষ্টেশনে গিয়াছে যাত্রী পাকড়াইবার জন্য; কেশবের স্ত্রী স্নান সারিয়া বসিয়া তরকারী কুটিতেছে, সোহাগী উঠানের কলে মাছ ধুইতেছে, এমন সময় জীর্ণ ওভারকোট গায়ে, হাতে

এক ক্যাম্বিসের ব্যাগ, একজন লোক আসিয়া কহিল, —এইটে চক্রবর্ত্তী মশায়ের যাত্রী-নিবাস ?

কথা শুনিয়া মা ও মেয়ে দুজনেই আগন্তুকের পানে মুখ তুলিয়া চাহিল। লোকটির চেহারা বিশ্রী—শীর্ণ দেহ। দুনিয়ায় বহু আঘাত খাইয়াছে—চেহারা দেখিলে সেই কথাটাই সর্ব্বাগ্রে মনে উদয় হয়! মুখে শীতলা দেবীও তাঁর করাঙ্ক বেশ নিবিড়ভাবে ছাপিয়া রাখিয়াছেন। তা হোক, তবু এত কদর্য্যতার মধ্য হইতেও একটা ভদ্র ভাবের আঁচ পাওয়া যায়...কথাবার্ত্তায় কেমন মমত্ব। মেয়ে সোহাগীই কথা কহিল, বলিল——হাঁ, এই তাঁর বাসা।

আগন্তুক কহিল,—এখানে জায়গা পাবো থাকবার ?

মেয়ে মা'র পানে চাহিল ; মা কহিল—পাবে গো।

আগন্তুক একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—আঃ, বাঁচলুম...কাল কি কষ্টই গেছে...

মা ডাকিল—সোহাগী...

সোহাগী মাছের টুকরি রাখিয়া হাত ধুইয়া মার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মা কহিল—উপরে যা। যে ঘরে

সেই ঢাকার বাবুটি থাকতো, সেই ঘর খুলে দি গে...' যা। ঘর পরিষ্কার আছে...এই অবধি বলিয়া আগন্তুকের পানে চাহিয়া মা কহিল—কত দিন থাকা হবে?

আগন্তুক কহিল,—পাঁচ-সাত দিন তো বটেই...তার পর ভালো লাগে, মাসখানেক থেকে যেতে পারি...

মা কহিল,—ঘর ভাড়া পড়বে আট টাকা...আর খাওয়া? নিজেই রেঁধে খাবে, না...?

আগন্তুক কহিল,—নিজে আর রেঁধে খাই কি করে? আশ্রয় যখন পেলুম...

মা কহিল,—তা ছ'বেলায়...ছুধ খাবে তো?

আগন্তুক কহিল,—যা দেবে, তাই খাবো।

মা কহিল,—খাবার জন্য রোজ এক টাকা হিসেবে দিতে হবে, বাপু।

আগন্তুক আবার হাসিল, হাসিয়া কহিল,—মাসে ত্রিশ টাকা...?

মা কহিল,—তা লাগ্‌বে বৈ কি! যে মাগ্‌গি-গণ্ডার দিন! তবে এক মাস থাকলে কিছু কম হবে...সে উনি এসে ঠিক করবেন।

আগন্তুক কহিল,—বেশ, তাই হবে। টাকার জন্ত আটকাবে না...

মা কহিল—যা সোহাগী, উপরের ঘর দেখিয়ে দিয়ে আয়। কখন্ ভাত চাই?

আগন্তুক কহিল—যখন দেবে...

মা কহিল—টাকাটা...আগাম কিছু...?

আগন্তুক কহিল—বেশ...এখন দশ টাকা রাখো... বলিয়া ওভারকোটের পকেট হইতে একটা মনিব্যাগ বাহির করিয়া তার মধ্য হইতে একখানি দশ টাকার নোট তুলিয়া মার হাতে দিল। মা আঁচলে হাত মুছিয়া নোটখানা ভাঁজ করিয়া কাপড়ের খুঁটে বাঁধিল, বাঁধিয়া মেয়েকে কহিল—দোতলার ছোট ছাদে বালতিতে জল আছে। একটা লোটা দিস্, মুখ-হাত ধোবার জন্ত... দিয়ে তুই ঝট্ করে নীচে আসবি। উন্নুনটা বোধ হয় ধরেচে, ডাল চাপিয়ে দিবি...তার পর আগন্তুকের পানে চাহিয়া মা কহিল,—তুমি...?

আগন্তুক হাসিয়া কহিল,—আমি ব্রাহ্মণ, আমার নাম মোহিনীমোহন ঘোষাল।

কথাবার্ত্তা চুকিল। সোহাগী আগন্তুককে লইয়া দোতলার ঘরে গেল, এবং দ্বার খুলিয়া কহিল—এই ঘর…

আগন্তুক ঘরে ঢুকিয়া কহিল,—বাঃ, তক্তাপোষও আছে…

সোহাগী কহিল,—আপনার বিছানা নেই ? তা…

আগন্তুক কহিল,—একটা বিছানা দিতে পারবে না ?

সোহাগী কহিল,—মাকে বলি গে। বলিয়া সে একখানা গামছা আনিয়া সেই গামছা দিয়া তক্তাপোষটা মুছিয়া দিয়া কহিল,—আপনি বসুন…আমি বিছানার চেষ্টা দেখি। হঁ্যা, ঐ দিকে ছাদে জল আছে, মুখ-হাত ধোবেন তো ?

আগন্তুক কহিল,—থাক্, তাড়া নেই। আগে একটু জিরুই। ভালো কথা, আন্‌লা তো দেখচি না…

সোহাগী কহিল,—দড়িটা ছিঁড়ে গেছে। একটা দড়ি খাটিয়ে দি…

বলিয়া সোহাগী বাহির হইয়া গেল। আগন্তুক তখন গায়ের ওভারকোট খুলিয়া তক্তাপোষ পাতিয়া তার উপর লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল।

পাঁচ-সাত মিনিট পরে সোহাগী ফিরিয়া আসিল, তার হাতে একটা মাদুর; আর গায়ে ঝুলানো একখানা বিলাতী কম্বল, এবং একগাছা মোটা দড়ি।

মোহিনী উঠিয়া বসিল, কহিল,—বাঃ, তুমি যে দেখতে দেখতে সমস্ত জোগাড় করে ফেলেচো!

সোহাগী সে-কথার কোনো জবাব না দিয়া মাদুর আর কম্বলটা তক্তাপোষে ফেলিয়া জানলার গরাদে দড়ির এক প্রান্ত বাঁধিয়া আর এক প্রান্ত বাঁধিল দেওয়ালের পেরেকে; তার পর মোহিনীর ওভারকোটটা তুলিয়া দড়িতে ঝুলাইয়া দিয়া কহিল,—এটা এইখানেই থাক্, কেমন?

মোহিনী কহিল,—বেশ।

সোহাগী কহিল,—উঠুন এক বার। এই দুটো পেতে দি। কাঠের ওপর কি মানুষ শোয়? গায়ে ব্যথা হবে যে···

মোহিনী বিনা বাক্যব্যয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল। সোহাগী মাদুর পাতিয়া তার উপর কম্বলখানা বিছাইয়া কহিল,—

এইবারে বসুন। একটা বালিশ দিয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ, মা জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কি চা খান?

মোহিনী সোৎসাহে কহিল,—চা! আছে না কি?

সোহাগী কহিল,—তা হলে দাও এক বাটি...শরীর যা হয়ে আছে, চা না খেলে জুৎ পাবো না···সোহাগী চলিয়া গেল।

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### দৈত্য-রাজ

পাঁচ-সাত দিন কাটিয়া গেছে। মোহিনী সেদিন কেশব চক্রবর্ত্তীকে ডাকিয়া কহিল,—এইখানেই আমি কায়েমিভাবে থেকে যাবো, ভাবচি। তোমরা ভারী ভালো লোক। তা মাসে আমার ঘরের ভাড়া আর খাওয়া-দাওয়ার বাবদ কি নেবে, ঠিক করে ফেলো চক্রবর্ত্তী মশায়—

চক্রবর্ত্তী চিন্তায় পড়িল। লোকটি অদ্ভুত...খরচ নিয়মিত দেয়, তা ছাড়া প্রায়ই বেড়াইয়া ফিরিবার সময় এটা-ওটা কিনিয়া তার সংসারে উপহার দেয়। কেশবের গৃহিণীকে ইতিমধ্যে এক জোড়া শাড়ী কিনিয়া দিয়াছে, সোহাগীকেও তাই ; তার উপর দুটা সেমিজ, দুটা রঙীন জ্যাকেট। এমন লোকের কাছে বেশী লোভ দেখাইতে

গিয়া যদি উল্টা ফল ফলে? সে কহিল,—আপনার যা খুশী, তাই দেবেন। আপনি তো ঘরের লোক হয়ে গেছেন, কিছু না নিতে পারলেই ভালো। তবে কি জানেন, ছাঁপোষা মানুষ—এই যা আয়। কাজেই...

মোহিনী কহিল,—নিশ্চয়। টাকা নেবে বৈ কি। যেখানেই থাকি আমি, ভাড়া তো দিতে হবে, তা ছাড়া খাওয়ার খরচও আছে! তা অপরকে না দিয়ে তোমাদের দিলে আমার তাতে তৃপ্তিই হবে। তার উপর আমার কিছু জমি-জমা আছে, তারি ভাড়া খাজনা যা পাই, তাতে একটা লোকের স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারে...তা আমার ঝক্কি তেমন কিছু নেই, সে পরিচয়ও তো এত দিনে পেয়েচো...দুটো বেশী পাণ খাই—এই যা...

কেশব কহিল,—না, না, আপনি থাকলে আমাদেরও বুকে একটা ভরসা পাবো। দিন-কাল যা পড়েচে, সে আর কহতব্য নয়!...তা আপনার যা খুশী দেবেন...

মোহিনী কহিল,—তুমি একবার বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে কথা কয়ে আমায় বরং বলো...আমার তাড়া নেই...

কেশব গৃহিণীর কাছে কথাটা পাড়িলে গৃহিণী খুশী

হইল। বাঁধা এক জন ভাড়াটিয়া পাওয়া...এ তো ভাগ্যের কথা! তায় এমন ভাড়াটিয়া! টাকা-পয়সা চাহিতে হয় না, উপরি পাওনাও ভালো রকম···গৃহিণী কহিল,—ওঁর যা খুশী, উনি দেবেন। তুমি লালচ করো না।

তাই হইল। মোহিনী এ গৃহে বেশ সমাদরেই স্থান পাইল। কেশব ও তার গৃহিণী তার বাধ্য হইয়া পড়িল, এবং এ বাধ্যতা নিতান্ত অকারণও নয়।

দুপুর বেলায় সেদিন দৈত্যের মত একটা লোক আসিয়া বাহিরে মহা কলরবের সৃষ্টি করিল। সে পুরানো পাওনাদার। কেশবের এক বার শক্ত রোগ হয়, সে সময় যাত্রীর অনাটন ঘটে, মাঝে হইতে ডাক্তার-বৈদ্য আসিয়া অনেকগুলা টাকা আদায় করিয়া লইয়া যায়; কাজেই সংসারটা ছন্নছাড়া অচল হইয়া পড়ে এবং সংসারকে আবার বাঁধিয়া লইবার জন্য কেশবকে হ্যাণ্ডনোট কাটিয়া দেড় শো টাকা ধার করিতে হয়। মহাজন বামাচরণ একজন ওস্তাদ লোক, বুড়া বয়সে কাশীবাস করিতে আসিয়া মহাজনী ব্যবসা-বুদ্ধিটুকু ভোলে নাই!

তাগাদার চোটে কেশবকে এক রকম অতিষ্ঠ করিয়া একশো টাকা সে আদায় করিয়া লইয়াছে, বাকী পঞ্চাশ আর তার সুদের জন্য মাসে তিন চারি বার খুব কড়া তাগিদ দিয়া যায়। আজ তার সেই তাগিদের পর্ব্ব।

মোহিনীর ঘরে বসিয়া মোহিনীর সঙ্গে কেশব গল্প করিতেছিল, সোহাগী একখানা গল্পের বই পড়িতেছিল। বইটা মোহিনীর ব্যাগের মধ্য হইতে সংগ্রহ করিয়াছে, এমন সময় বামাচরণ ডাকিল,—কোথায় হে চক্কোবর্ত্তী?

ডাক শুনিয়া কেশব একেবারে কাঠ! ধীরে ধীরে নামিয়া গিয়া খুব শান্ত মৃদু ভাষায় বামাচরণকে সে কি বুঝাইতে গেল। কিন্তু বামাচরণ বুঝিবার পাত্র নয়! সে হুঙ্কার ছাড়িল এবং এক নিমেষে সে হুঙ্কার প্রকাণ্ড বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়া তুলিল। এ সব কথাগুলা নূতন অতিথি মোহিনীর কাণে পাছে প্রবেশ করে, এই ভয়ে কেশব আড়ষ্ট! কিন্তু বামাচরণ ছাড়িবে কেন? সে পাওনাদার মহাজন, কাশীর বিশ্বনাথকেই সে বড়

কেয়ার করে না, তা এ তো একটা যাত্রী-নিবাসের মালিক! কলরব শুনিয়া মোহিনী সোহাগীকে কহিল—ও কে চেঁচাচ্ছে? মাতাল না কি?

সোহাগী প্রায় কাঁদ-কাঁদ স্বরে কহিল—না, বামাচরণ চাটুয্যে......

মোহিনী কহিল,—বামাচরণটি কে?

সোহাগী পরিচয় দিল,—এবং শুধু পরিচয় নয়, তার সঙ্গে এ বাড়ীর কি সম্পর্ক, তাও সংক্ষেপে বিবৃত করিল। তাগাদায় আসিয়া তার মাকে এবং তাকেও যে কি রকম বিশ্রী শক্ত কথা শুনাইয়া যায়, সেগুলা সঠিক না বলিলেও বামাচরণের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ও দারুণ নিঃশঙ্কতার একটু আভাষও সে দিয়া ফেলিল। শুনিয়া মোহিনী রাগে জ্বলিয়া নামিয়া আসিল; কহিল—কি হে বাপু ভুঁড়িদাস, দুপুর বেলায় লোকের বাড়ী এসে এত তম্বি করচো কেন? ডাকাতি করবে না কি?

বামাচরণ অবাক্! এ তল্লাটে তার মুখের দিকে চাহিয়া কথা কয়, এমন প্রাণী একটিও নাই, আর এই

লক্ষ্মীছাড়া ভাড়াটিয়া...সে কহিল—তুই কে রে ভোগোল......?

মোহিনী মুখ বাঁকাইয়া কহিল—যেমন চেহারা, তেমনি মুখের কথা! সহরে কেন—চেরাপুঞ্জির জঙ্গলে গিয়ে বাস করো গে। ও ভাষা নিয়ে ভদ্রসমাজে মুখ দেখিয়ো না।

বামাচরণ কহিল—থাম্ তুই ইষ্টুপিড! নিজে একেবারে রূপের কন্দর্প...যাক, তোর সঙ্গে কথা কইতে আসিনি...বলিয়া সে কেশবের পানে চাহিল, কহিল,—শোনো হে চক্কোবর্ত্তী, আর ছেঁদো কথায় ভুলচি না... এখনি টাকা চাই। না দাও, কাল দেবো নালিশ ঠুকে, তার পর ডিক্রী পেয়ে তোমার পরিবার আর সেই সোমত্ত মেয়েকে ক্রোক করে নিয়ে যাবো, রেয়াত করবো না। আমার নাম বামাচরণ চাটুয্যে......

মোহিনী তার এ ইতর কথায় রাগিয়া উঠিয়া কহিল,—তবে রে ছুঁচো...যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! বেরো শূয়ার, কর্ গে যা নালিশ...তোর ঐ জিভ্ আমি উপড়ে ছিঁড়ে দেবো, ফের যদি অমন কথা

মুখেঁ উচ্চারণ করবি!···আমার নাম মোহিনী ঘোষাল, খাশ্ কলকাতায় বাস!

বামাচরণ কহিল,—খাশা......! এটিকে কি জামাই করে পালচো না কি হে চক্কোবর্ত্তী......? বেশ, বেশ, পারো তো একেই উকীল দিয়ো। লড়বার মুখ আছে।

মোহিনী কহিল,—সে লড়া আদালতে তখন যা হবার হবে। এখন লড়া দেখবে? এই উকীল গুণে পাঁচ কিলে তোমার ঐ ভুঁড়ি ফাঁশিয়ে দিতে পারে।

কথাটা বলিয়া মোহিনী আগাইয়া আসিয়া আক্রমণোদ্যতভাবে দাঁড়াইল। বামাচরণ এই লোকটির দুঃসাহস দেখিয়া একটু ভড়কাইয়া গেল। সে কহিল,—আমি তো মারামারি করতে আসি নি বাপু, আমি এসেচি টাকা আদায় করতে......

মোহিনী কহিল—তা হলে অত লম্বা কথা চালাও কেন? ঝুলি পেতে দাঁড়াও ভিখিরীর মত—

ভিখারী! বটে! বামাচরণ রাগে ফুলিতে লাগিল; কিন্তু গোঁয়ার লোকটাকে কিছু শুনাইতে তার ভরসা

হইল না। মোহিনী বলিল,—কত টাকা পাবে, বলো… ফেলে দিচ্ছি আমরা……

বামাচরণ কহিল—বেশ, দাও, এখনি দাও।…বলিয়া সে তার খাতাপত্র বাহির করিয়া কহিল,—সাতাশী টাকা সাড়ে পনেরো আনা।

মোহিনী কহিল,—আচ্ছা, দেখি……বলিয়া মোহিনী হিসাব পরীক্ষা করিয়া তার পর কহিল,—এই ক'টা টাকার জন্যে চোখ রাঙাতে এসেচো……!

বামাচরণের মাথায় মস্ত এক ফন্দী ছিল। টাকার ভয় দেখাইয়া সে ফন্দী কাজে খাটাইবে, সে সম্বন্ধে তার এতটুকু সংশয়ও ছিল না। আজ পাঁচ বৎসর তার স্ত্রী মারা গিয়াছে, এখন এই কেশবের মেয়েটিকে…… কিন্তু সে ফন্দী ফাঁশিয়া যাইবে?…সে নিরুপায় হতাশ দৃষ্টিতে মোহিনীর পানে চাহিল। মোহিনী কহিল,—দাঁড়াও, টাকা এনে দিচ্ছি। বলিয়া সে উপরে গেল এবং দশ মিনিটের মধ্যে টাকা আনিয়া গণিয়া বামাচরণের সামনে ফেলিয়া কহিল,—টাকা নাও, নিয়ে রসিদ দাও, আর হ্যাণ্ডনোট্ ফেরৎ দাও।

বামাচরণ কহিল—বেশ, দিচ্ছি রসিদ......

টাকা লইয়া রসিদ ও হ্যাণ্ডনোট্ ফেরত দিয়া বামাচরণ চলিয়া গেল। কৃতজ্ঞতায় কেশব একেবারে গলিয়া গিয়া ছল-ছল চোখে মোহিনীকে কহিল,—এ কি উপকার যে আজ করলে, বাবা!

হাসিয়া মোহিনী কহিল—কিছু না, কিছু না। টাকাগুলো এমনি পড়ে ছিল, কোনো কাজে লাগছিল না, তার একটা হিল্লে হলো তবু... ..

এই ঘটনার পর হইতে কেশব সপরিবারে মোহিনীর কাছে একেবারে যেন বিক্রীত হইয়া রহিল। একদিন কেশব কহিল,—তুমি ভাড়া দিয়ো না বাবা। এত টাকার ঋণে ঋণী করেচো···

মোহিনী কহিল,—ভাড়া না দিয়ে আমি থাকবো না, তা হলে পথ দেখতে হবে।

কেশব শিহরিয়া কহিল,—থাক বাবা, আর কিছু বলবো না। তোমার যা খুশী হয়, করো······

---

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### বজ্রাগ্নি

সেবার খুব বর্ষা নামিয়াছিল। আকাশ ফাটিয়া যেমন অবিরাম জল-ধারা, নদীর বুক ফুলিয়াও তেমনি তীব্র জলোচ্ছ্বাস! কাশীর গলি বহিয়া নদী একেবারে সহরে আসিয়া ঢুকিল। লোকের কষ্টের আর সীমা-পরিসীমা রহিল না।

কেশব সপরিবারে রোগে পড়িল। দু-চারদিন ভুগিয়া তারা স্বামী-স্ত্রীতে সারিয়া উঠিল, কিন্তু সোহাগীর জ্বর নানা বাঁকা পথ ধরিয়া এমন মূর্ত্তি ধরিল যে, মেয়ের ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া মা-বাপের চক্ষু কপালে উঠিল। সোহাগীকে বুঝি বা এ-যাত্রা হারাইতে হয়!……

মোহিনীর মনটা চট্ করিয়া তার বৈরাগ্যের খোলশ ফেলিয়া মায়া-মমতায় ভরিয়া উঠিল। দিন-রাত সে

সোহাগীর বিছানার পাশটিতে পড়িয়া থাকে। টাকা-পয়সা খরচ করিয়া ডাক্তার-ঔষধ···যে যা বলিল, কোনখানে সে তার কোন ত্রুটি রাখিল না। নিজের হাতে ঔষধ খাওয়ানো, মাথায় বরফ দেওয়া, স্পঞ্জিং করানো—ঐ শীর্ণ শরীরে এমন হাতীর বলও লুকানো ছিল! দিনে-রাতে এক তিল সে রোগীর পাশ ছাড়িয়া নড়িতে চায় না···রাতের ঘুমটুকুকেও কোথায় বিসর্জ্জন দিয়া বসিয়াছে! কেশবের স্ত্রী আসিয়া কত সাধিয়াছে,—একটু ওঠো বাবা······তোমার মানুষের শরীর তো······

মোহিনী মুখ না তুলিয়া শুধু মৃদু স্বরে জবাব দিয়াছে,—চুপ!

এ কথার উপর মা আর দ্বিতীয় কথা তোলে নাই। কেশব? সে একেবারে কাঠের পুতুলের মত হইয়া গিয়াছিল······দুনিয়ার এমন রুদ্র সংহার-মূর্ত্তি সে বড় দেখে নাই। এই বর্ষায় বাহির হইতে যাত্রী আসা বন্ধ, উপার্জ্জনের নামটি নাই, আর ঘরে এই রোগের ধূম—খরচের চূড়ান্ত! ভাগ্যে মোহিনী ছিল! নহিলে কি যে হইত!······স্ত্রী বলে,—মোহিনী আর-জন্মে আমাদের

কেউ ছিল গো……কেশব চুপ করিয়া থাকে, বুঝি ভাবে, আর-জন্মে যে-ই থাক্, এ জন্মে ঐ মেয়েটাকে বাঁচাইয়া তুলিয়া তার ভার লইতে সে যদি রাজী হয়! বয়স? হোক কিছু বেশী বয়স, তার এত বড় বিপদে মোহিনী তাকে কতখানি নিশ্চিন্ত রাখিয়াছে!

অমন সেবা! সোহাগী ভুগিয়া ভুগিয়া সারিয়া উঠিল। মোহিনীর সঙ্গ সে আর ছাড়িতে চায় না, —গল্প চাই··· গল্প বলো।

সেদিনও গল্প চলিয়াছিল।……

কত কথা……মোহিনী কোথায় ছিল, তার ঘর কোথায়…কে আছে……এই সব। মোহিনী তার জীবনের অনেক কথা বকিয়া চলিয়াছিল……তার জীবনের উপর দিয়া কি ঝঞ্ঝাই বহিয়া গিয়াছে! নহিলে তার কি না ছিল! আর এখন? তার দুই চোখ যেন জ্বলিতে লাগিল! তার স্ত্রী ছিল……সুন্দরী স্ত্রী·· শয়তানের ছলায় ভুলিয়া সে চলিয়া গেল! সেই দিন হইতে মোহিনী ছন্নছাড়া, বৈরাগী···তাদের কোথায় যে না খুঁজিয়াছে……

সোহাগী ম্লান চোখে মোহিনীর পানে চাহিল। যৌবনের রক্তিম রাগ তার সারা অঙ্গে অপরূপ লাবণ্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে...ভবিষ্যৎ সুখের স্বপ্ন-মাধুরী তার ঐ দুই চোখের দৃষ্টিতে কি রঙীন আভাস যে জাগাইয়া রাখিয়াছে!

মোহিনী ভাবিল, আর একবার জীবনটাকে গড়িয়া তোলা যায় না? বুক তার ভাঙ্গিয়া খালি হইয়া গিয়াছে। এই সোহাগীর হাতের স্পর্শে সে বুককে আবার ভরাইয়া তোলা…?

সোহাগীর হাত সে নিজের হাতে চাপিয়া ধরিল, মৃদু স্বরে ডাকিল,—সোহাগী—

সোহাগী চমকিয়া তার পানে চাহিল, কহিল—কি?

মোহিনী কহিল,—এখনো আমার যা টাকা-কড়ি আছে, তাতে আবার উঠে দাঁড়াতে পারি......

সোহাগী এ কথার অর্থ না বুঝিয়া তার পানে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল! মোহিনীর একটা ধ্বক করিয়া উঠিল, তার এই জীর্ণ দলিত ...ন...তা লইয়া কি খেলা আবার সে খেলিতে চায়? সে সোহাগীর

হাত ছাড়িয়া দিল, দিয়া হাসিয়া কহিল,—আমি এইখানে থাকবো বরাবর···তার পর তোমার বিয়ে হয়ে গেলে তুমিও পরের ঘরে যাবে, আমিও এখান থেকে সরে পড়বো।

সোহাগী এ কথার কোনো জবাব দিল না,—অপলক নেত্রে মোহিনীর পানে চাহিয়া রহিল। সে কি ভাবিতে-ছিল!..

তার সে দৃষ্টি দেখিয়া মোহিনীর বুকের কোণে আবার সেই লোভ আসিয়া দেখা দিল। তবে কি তার আশা একেবারে দুরাশা নয়?...সে আবার সোহাগীর হাতখানি নিজের হাতে তুলিয়া লইল, আবার ডাকিল,—সোহাগী...

সোহাগী তেমনি চাহিয়া...পুতুলের চিত্র-করা দুই চোখ যেন! এ দৃষ্টির মানে? মোহিনী কহিল,—একটা কথা বলবো? সোহাগীর উদাস দৃষ্টি তেমনিভাবে মোহিনীর মুখের পানে।

মোহিনী কহিল,—তোমায় রাণীর মত রাখবো, সোহাগী...আমায় বিয়ে করবে? এত বড় দুনিয়ায় আমার

কেউ নেই! মুখের পানে চায়, একটু দরদ করে, এমন কেউ আপন-জন নেই আমার! বুক আমার ভেঙ্গে গেছে, অথচ অজস্র সাধ এখনো এ ভাঙ্গা বুকে...তার স্বর কাঁপিয়া ঝরিয়া গেল। মোহিনী একটা নিশ্বাস ফেলিল। তার পর একটা উত্তরের প্রত্যাশায় ব্যাকুলভাবে...

সোহাগীর দুই চোখের কোণে বড় বড় দু ফোঁটা জল! মোহিনী চমকিয়া উঠিল, চোখে জল কেন?

মোহিনী কহিল,—তুমি কাঁদচো সোহাগী! কেন?... বলো...বলবে না?

সোহাগী একটা নিশ্বাস ফেলিল, তার পর চোখের জল মুছিয়া ধীরে ধীরে সে ঘর হইতে চলিয়া গেল।...

মোহিনী বহুক্ষণ উদ্‌ভ্রান্তের মত বসিয়া রহিল... নিমেষের মোহ! সেই মোহে মজিয়া কি এ ছেলেমানুষী করিয়াছে সে! একটি অনাঘ্রাত ফুল, সদ্য-ফোটা, শিশিরে ধোওয়া, তাজা...তারি মত নির্ম্মল প্রাণ... দুনিয়ার দাব-দাহে তপ্ত মোহিনীর বুকে ও ফুল রাখিলে তার এ মধুর ঘ্রাণটুকু কতক্ষণ! সে কুৎসিত, তা' বয়স হইয়াছে। আর সোহাগী?...বুকে অজস্র সাধ-আশার

কুঁড়ি, দুই চোখে রঙীন স্বপ্নের আভাস! জীবন-পথে যাত্রা সুরু করিবে বলিয়া কম্পিত বুকে পথের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে...সোহাগী সঙ্গী চায়, সাথী চায়···এমন সঙ্গী, যার বুকে অমনি আশা, অমনি সাধ! অতীতের এতটুকু কালি, এতটুকু জঞ্জাল যার বুকে লাগে নাই—বুকের পাতা যার খালি, ইতিহাসের একটি অক্ষরের দাগ পড়ে নাই, এমন সঙ্গী হইলেই না মানায়! আর সে কি বলিয়া ঐ হৃদয়ের দ্বারে এ কামনা লইয়া দাঁড়ায়? তাই সোহাগী চলিয়া গেল? মনে বেদনা পাইয়া···? সে মূঢ়, সে নীচ, সে লক্ষ্মীছাড়া···ছি, ছি...ধিক্কারে অনুশোচনায় মোহিনীর মন ভরিয়া উঠিল।

কতক্ষণ পরে সে উঠিয়া বাহিরে আসিল···সোহাগী? না, সে তো ওখানে নাই। তবে কি ঘরে? থাক, সুখে থাক, আরামে থাক সোহাগী! সে তার দগ্ধ জীবনের তপ্ত নিশ্বাসের ঝাঁজ সোহাগীর তরুণ প্রাণে এতটুকু লাগিতে দিবে না!···

অধীর আবেগে সে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল, যে-ধারে দু' চোখ যায়! সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিল; ফিরিতে

কেশব চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে দেখা হইল। কেশব কহিল,—একটা পরামর্শ আছে…

মোহিনীর বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। সোহাগী কিছু বলিয়াছে না কি? সে কহিল,—কি?

কেশব কহিল,—চা আনতে বলি, আগে চা খাও… তার পর বলচি…

মোহিনী কহিল,—মানে, সোহাগীর বিয়ের কথা ভাবচি ক' দিন।

মোহিনী অতি-কষ্টে একটা নিশ্বাস রোধ করিল। কেশব কহিল,—বিয়ে এবার দেবো, পাত্রও রয়েচে…

মোহিনী কাঁপিয়া উঠিল। এ-ধারে ও-ধারে চাহিল, কে এ পাত্র? একটু আশা, আবার নিরাশা…তার বুক দুলিয়া উঠিল।

কেশব কহিল,—একটু গোড়ার কথা বলতে হয় তা হলে…

না, তা নয়, তা নয়…মনে এইমাত্র যে আশা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছিল…?

কেশব কহিল,—শ্রীপতি হালদার আর আমি, দু'জনে

কলকাতায় থাকতুম। আয় তেমন ছিল না, অথচ পয়সার খুবই দরকার ছিল। যাক, কতকগুলো বদ কাজ করে ফেলি…তার ফলে পুলিশের নজরে পড়ি। মামলা হয়...ভালো উকীলের বুদ্ধির জোরে খালাস পাই। শেষে এ-দেশ ও-দেশ ঘুরে এখানে এসে আমি এই কাজ নিয়ে আছি। শ্রীপতির লোভ ছিল বেশী…সে কলকাতায় রয়ে গেল...তবে নাম বদলে ফেললে, আর পাড়া ছেড়ে দিলে। তার পরিবার ছিল ভারী তেজী...শ্রীপতির একটি ছেলে…ছেলেকে নিয়ে সে বাপের বাড়ী চলে গেল। তার বাপের কিছু জমি-জমা ছিল। বাপের ঐ এক মেয়ে, বাপ থাকতো পাড়াগাঁয়ে...ছেলেটি মানুষ হতে লাগলো মাতামহের পয়সায়। একটা পাশ করে ছেলে কলকাতায় গেল। মেশে থাকতো। তার পর আরো একটা পাশ দিয়ে হঠাৎ কলকাতা ছেড়ে দেশে যায়, বলে, কি নাকি চাকরি পেয়েচে! যাক্, দু বছর বিদেশে থেকে মার কাছে ফিরে আসে। এই কাশীতেই এখন চাকরি পেয়েচে…মাকে নিয়ে এসেচে…তা, সোহাগীর সঙ্গে তার বিয়ের কথা রয়েচে, সেই বহুকাল থেকে,

দুটিতেই তখন খুব ছোট! তার পর দু'জনে দু'দিকে...

মোহিনী ভাবিল, তাকে এ সব কথা বলা কেন? সে চুপ করিয়া কেশবের কাহিনী শুনিতে লাগিল।

কেশব কহিল,—সোহাগী আর শ্রীপতির ছেলে—দুটিতে ভাবও ছিল। ছেলেবেলা থেকেই তাদের বর-কনে বলে আমরা ডাকতুম। তারাও তাই জানতো। তা এইবারে ভাবচি, বিয়ে দেবো। শ্রীপতি মারা গেছে, তার পরিবার ধরেচে...এত দিন ছেলেরও বিয়ের মত ছিল না, এখন হয়েচে ··

মোহিনী কহিল,—ছেলেটি চাকরি করচে?

কেশব কহিল,—হঁ্যা। এখানে এক স্কুলের মাষ্টার সে। তাছাড়া খাশা লিখিয়ে হয়েচে নাকি—এমন কবিতে লেখে, তা আবার ছাপা হয় কাগজে...

হাঁ, হালদারের ছেলে! লিখিয়ে! কলিকাতার মেশে থাকিত! একটা চিন্তা ছুঁচের মত মোহিনীর বুকে বিঁধিল...

মোহিনী কহিল,—তা, এর আর পরামর্শ কি! [illegible] দিয়ে ফ্যালো ··

কেশব কহিল,—তাই বলা, বাবাজী...এ সময় আমায় কিছু সাহায্য করতে হবে। কুকুরকে যখন নাই দেছ, বুঝলে কি না...

মোহিনী কহিল,—বেশ।

কেশব কহিল,—গিন্নী গেছেন তাদের বাড়ী বেড়াতে সোহাগীকে নিয়ে···

মোহিনী কহিল,—সোহাগী তাদের ওখানে যায় তা হলে?

কেশব কহিল,—তা যায়···ছেলেবেলা থেকেই জানাশোনা কি না...

মোহিনী ভাবিল, তাই – তাই কি সে চোখের জল...? না বুঝিয়া তাহা হইলে কি বেকুবিই সে করিয়াছে···

কেশব কহিল,—তাছাড়া তারা বেশী দূরেও থাকে না—ঐ কেদার-ঘাটের কাছে...

মোহিনী শুধু গম্ভীর স্বরে কহিল—হুঁ...

---

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

### বাদল-ধারা

দু'দিনে মোহিনী মনটাকে ঠিক করিয়া ফেলিল। মানুষের বুক একবারই ভরে......খালি হইলে ভরাইবার চেষ্টা চলে, যা-তা দিয়া ভরানো যায়, তবু আগেকার মত ভরে না! কাচ ভাঙ্গে, জোড়া-তালি চলে, তা বলিয়া তেমন আর দাঁড়ায় না। জোড়ার মস্ত দাগ থাকিয়া যায়—এমন দাগ, যার পানে তাকাইলে মানুষের চোখ কর্‌কর্‌ করিতে থাকে! তবু সে কাচ—নেহাৎ জড়বস্তু! আর মানুষের মন?...তার কি তুলনা আছে, না, তার সঙ্গে আর কোনো বস্তুর উপমা চলে!......

বৈকালের দিকে আন-মনে মোহিনী চলিয়াছিল, অসির দিকে...দুর্গা-বাড়ীটা ঘুরিয়া আসা যাক, এমনি ভাবিয়া! কেশবরা কেহ গৃহে নাই; সোণাও

নাই......সকলে গিয়াছে সেই হালদার-গোষ্ঠীর গৃহে!... তার দুঃখ নাই......তাকে অযত্ন-অবহেলা কেহ করে না, সোহাগীও না। সেদিনকার সে সব কথার পরেও না! সোহাগী তেমনি আছে। হাসে, খেলা করে, আব্দার ধরে......আর মোহিনী শিহরিয়া ভাবে, হায় রে, এই বালিকার কাছে সে কি বহ্বারম্ভের অভিনয়ই না করিতে গিয়াছিল!......

হঠাৎ সেদিন পথের উপর দেখা সামনা-সামনি। সেই শয়তান!—যে তার ঘর জ্বালাইয়া, বুক ভাঙ্গিয়া এই বয়সে তাকে জীর্ণ দলিত করিয়া দিয়াছে......না হইলে বয়স তার এখনো ত্রিশ পার হয় নাই। কিন্তু চেহারা দেখিলে সে কথা কে বিশ্বাস করিবে?

উন্মাদের মত সে গর্জ্জন তুলিল—পাজী, শয়তান......

সঙ্গে সঙ্গে তাকে জাপটাইয়া ধরিয়া ভূমে ফেলিল। পথিকরা অকস্মাৎ এ ব্যাপার দেখিয়া ভয় পাইয়া ছুটিয়া পলাইল।......

দোকানী দোকানের রোয়াকে বসিয়া মজা দেখিতে লাগিল। কাশীর পথে এমন মজা নেহাৎ নূতন নয়। তবু...

সে লোকটার বয়স অল্প, ভদ্র বেশ…মাথার চুলগুলা ঝাঁকড়া, গোঁফ-দাড়ি কামানো……সৌখীনতার প্রয়াস বেশেভূষায় আকারে-অবয়বে সর্ব্বত্র !……

দু'চার জন লোক ছুটিয়া আসিয়া আক্রমণ রোধ করিল। মোহিনী কহিল—এ আসামী……এর নামে হুলিয়া পরোয়ানা আছে।

একজন পথের লোক কহিল—তা বলে মারতে পারো না তুমি। থানায় নিয়ে যাও……

লোকটা ভীত দৃষ্টিতে মোহিনীর পানে চাহিল, চিনিল। সেই লোক! তার মেশের পাশে থাকিত! পুষ্পমালার স্বামী। যে পুষ্পমালাকে লইয়া এক গভীর রাত্রে সে সরিয়া পলাইয়া যায়! বায়োস্কোপের দৃশ্যের মত অতীতের একরাশ চিত্র তার চোখের সামনে চকিতে ফুটিয়া সরিয়া গেল! হুলিয়া? সর্ব্বনাশ! তার একটা নাম আছে…সম্ভ্রম আছে…আর অকস্মাৎ এই? তবু, একবার চেষ্টা……

সে কহিল,—আপনি ভুল করচেন……ভদ্রলোকে অপমান করবেন না এমন ভাবে……

নিরীহ লড়াই দেখিয়া ভিড় আবার জমিয়া উঠিয়াছিল ...ভিড়ের মধ্য হইতে একজন কহিল—কি হয়েচে হে ভুজঙ্গ...?

ভুজঙ্গ কহিল—পাগল! বলে কি, শোনো না......

মোহিনী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ভুজঙ্গকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তার মুখে কোনো কথা নাই। ভুজঙ্গ সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল। মোহিনী তার হাত ধরিয়া কহিল—না......থানায় চলো। অনেক জিনিষ ভুলেচি, মানি......কিন্তু তোমায় ভুলিনি। পুষ্প? সেই ঘর? মনে আছে? সে-পুষ্প এখন কোথায়?

সহসা কড়কড় শব্দে বাজ হাঁকিলে মানুষের শিরায় শিরায় সে-ধ্বনি যেমন কাঁপনের ঝন্‌ঝনি জাগাইয়া তোলে, মোহিনীর কথাগুলা ভুজঙ্গের শিরায় শিরায় তেমনি ঝন্‌ঝনি জাগাইয়া তুলিল! বহু-দিন-ভোলা দারুণ দুঃস্বপ্ন আজ চাক্ষুষ, প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। এখন এ দায়ে রক্ষা হয় কি করিয়া?

ভিড়ের মধ্য হইতে একজন আসিয়া কহিল,—কি

করো......পাগলামির কি আর জায়গা পাওনি? চলে এসো ভুজঙ্গ...মিটিং তোমার জন্যে বসতে পাচ্ছে না...... তোমার কবিতা পড়া হবে আগেই। শুনলুম, তোমাদের বাড়ী তোমার ভাবী পত্নী এসেচেন......তোমার বাড়ী গেছলুম এই ভেবে যে, হয়তো তাঁর অভ্যর্থনায় মশগুল হয়ে মিটিংয়ের কথা ভুলে গেছ......

কথাগুলা মোহিনী সুস্পষ্ট শুনিল। এ সেই কলিকাতার মেশে থাকিত......তার পুষ্পকে চিঠি লিখিত, বই পাঠাইত, তাঁর সঙ্গেও আলাপ করিয়াছিল,—চা খাইতে আসিত... কবিতার আলোচনা করিত; বড় বড় কথা বলিত...... সেক্সপীয়র, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ,......শেলি, কীট্‌স্ বার্গশঁ...স্বদেশ, মহাত্মা, কংগ্রেস, খদ্দর...তার পর একদিন সহসা বুকে কি বাজ ফেলিয়া মোহিনীকে কি-ভাবেই না চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়া পলাইল...এখনো সে কবিতা লেখা চলে। বাঃ!

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা মনে জাগিল, বিদ্যুতের রক্ত-শিখার মত......কেশব বলিয়াছিল...পাত্রটি স্কুল মাষ্টারী করে, মস্ত লিখিয়ে, কাগজে তার লেখা ছাপা হয়!

মোহিনী কহিল,—তুমি কি কাজ করো ?

একজন কহিল—চেনেন না ? উনি ভেডিক স্কুলের টিচার·····

মোহিনী কহিল—আমাদের কেশব চক্রবর্ত্তীর হবু জামাই না ?

ভুজঙ্গ আতঙ্কে নীল হইয়া গেল। মোহিনী কহিল—ভয় নেই। সে বাঁদরামি প্রকাশ হবে না। আমার সঙ্গে একটু এসো দিকিন্...কথা আছে···

ভুজঙ্গ মন্ত্রাহত ভুজঙ্গমের মত মোহিনীর সঙ্গে আসিল। মোহিনী কহিল—সোহাগীর সঙ্গে তোমার··· ?

ভুজঙ্গ মাথা নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

মোহিনী কহিল—ভয় নেই,—এ কথা তারা কেউ জানবে না। মোদ্দা, নারীকে সম্মান করো, মর্য্যাদার চোখে দেখো। নারী বিলাসের খেল্‌না নয়। সোহাগীকে সুখী করো। সে তোমায় ভালোবাসে। যদি কোনো দিন তার অমর্য্যাদা বা তাকে অবহেলা করো—জেনো, এই হুলিয়া ব্রহ্মাস্ত্র আমার হাতে রইলো ! তোমার ঐ কবি-খ্যাতি সেই দিন আদালতে চূর্ণ করবো···মনে থাকবে ?

ভুজঙ্গ কহিল—থাকবে।

মোহিনী কহিল—যাও...

ভুজঙ্গ চলিয়া গেল। মোহিনীও সরিয়া একেবারে দশাশ্বমেধ ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল···ঘাটের একধারে সে গুম হইয়া বসিয়া রহিল···যেন নিশ্চল পাথরের মূর্ত্তি!

সন্ধ্যা হইল। ঘাটে লোক-জন আসিল,—তার পর তারা চলিয়া গেল। রাত্রি ক্রমে গভীর হইল। আকাশে রাশি রাশি নক্ষত্র ফুটিল। মোহিনীর চমক ভাঙ্গিল...সে উঠিল, উঠিয়া গৃহে আসিল।

কেশব কহিল—ব্যাপার কি? আমরা ভেবে অস্থির ···কি হয়েচে?

মোহিনী কহিল,—কিছু হয়েচে। আমায় কালই চলে যেতে হবে—উপায় নেই......সোহাগীর বিয়ের যৌতুকের জন্য দু'খানা গহনা আর কিছু টাকা দিয়ে যাচ্ছি, ওকে সে গহনায় সাজিয়ে সম্প্রদান করো, ঠাকুর। এ কথাটি আমার রেখো...বুঝলে?

কেশব অভিভূত হইয়া কহিল—ছি, ছি, কি বলো